খেয়াল

ছেলেমেয়েদের গল্পের বই

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

প্রকাশক :

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

॥৹ আনা

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স, লিঃ
আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
পাটুয়াটুলী, ঢাকা

১৩৪১

কলিকাতা
৫নং কলেজ স্কোয়ার
শ্রীনারসিংহ প্রেসে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

উপহার

সূচী

খেয়াল

পাগলের খেয়াল

মেঘনাদ ঘোষকে চেন তো? ঐ যে, ও পাড়ার জলধর ঘোষের ছেলে। ছেলেবেলা থেকে বেচারার গলাখানা একেবারে মেঘের নাদেরই মতন, তাই তার ঐ নাম রাখা হয়েছে। গায়ের রঙেও মেঘের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে—যেন কাল-বৈশাখীর কালো মেঘ। বেচারার যখন ১০ বছর বয়েস তখনই তা'র বুকের ছাতি চল্লিশ ইঞ্চি, আর লম্বায় তখনই সাড়ে তিন হাতের উপর।

আমাদের পাড়ায় সাতকড়ি মিত্তির থাকে; তার জিম্‌নাষ্টিকের আড্ডায় মেঘনাদ রীতিমত 'এক্সারসাইজ্' ক'রে চেহারাখানাকে আরো ভাল ক'রে সানিয়ে নিয়েছে। চৌদ্দ বছর বয়সে তার

ছাতি হ'লো আটচল্লিশ ইঞ্চি; হাতের গুলি ফোলা'লে হ'তো প্রায় ৩৮ ইঞ্চি। তখন সে লম্বায় ছিল সোয়া চার হাত।

বেচারা কিন্তু পড়াশুনায় তত সুবিধা করতে পারত না। অঙ্কে বহু চেষ্টা-চরিত্র ক'রে সে একবার ৪ নম্বর পেয়েছিল—সচরাচর ০ থেকে ২ এর মধ্যে পেতো। বাংলায় সে ভাল নম্বর পেতো; কবিতাও কিছু কিছু লিখ্‌ত।

গত বছর একদিন সাতকড়ির জিম্‌নাষ্টিকের আড্ডায় মেঘনাদ 'প্যারালেল্ বার'এর খেলা দেখাচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ক'রে হাত পিছ্‌লে পড়ে গেল,—আর, পড়্‌বি-তো-পড় একেবার মাথাটি নীচে রেখে। হঠাৎ 'ড্ড—গ্—গ্' ক'রে আওয়াজ হ'লো আর সঙ্গে সঙ্গে মেঘনাদও অজ্ঞান।

'ধর্—ধর্'—'তোল্—তোল্'—'ডাক্তার ডাক্'—'বরফ আন্'—চারিদিকে গোলমাল সুরু হয়ে গেল। লাশখানা তো কম নয়! চারজনে বহু কষ্টে ধরাধরি ক'রে এনে পাশের ঘরে বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাক্তারও এলেন আর নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন "অবস্থা গুরুতর!"

যা'হোক! কোন রকমে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে, চার পাঁচজন ভাল ডাক্তারের চিকিৎসায় মেঘনাদের তো জ্ঞান হ'লো,—কিন্তু মাথাটা পরিষ্কার হ'লো না; থেকে থেকে আবোল-তাবোল বকে; কখনও হাসে, কখনও কাঁদে।

দু' মাস যায়, চার মাস যায়, মেঘনাদ আর ভালো হয় না।

দিব্যি ঘুরে বেড়ায়, খায় দায়, কিন্তু আবোল-তাবোল বকাটা আর বন্ধ হ'লো না। হঠাৎ থেকে থেকে ছাতের সমান উঁচু লাফ গোটা কয়েক দেয়, আবার শূন্যে ঘুঁষিও চালায়।

ছাতির মাপ পঞ্চাশ ইঞ্চি; হাতের গুলি ৩৬ ইঞ্চি; লম্বায় সাড়ে চার হাত,—এমন একটি লোক পাগল হ'লে তা'কে সমীহ ক'রে চলারই কথা। আমরাও তাই সর্ব্বদাই তা'র থেকে তফাতে থাক্‌তাম।

সেদিন সকাল বেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি; হঠাৎ দেখি মেঘনাদ আস্‌ছে। একবার হেসে চোখ টিপ্‌ছে, তার পরের মুহূর্ত্তেই কট্‌মট্ ক'রে তাকাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের তৈরী কবিতা আওড়াচ্ছে ঃ—

"শীতকালে চীৎকার গীত গাই গুণ্ গুণ্;
হাতে পেলে বেটাদের নিমেষেই করি খুন।"

যাঁহাতক্ আমাকে দেখা, অম্‌নি ছাতের সমান লাফ দিয়ে দারুণ হুঙ্কার ছেড়ে আমাকেই তাড়া করল্‌। ভয়ে তো আমার আত্মারাম শুকিয়ে গেল, প্রাণের দায়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলাম। ছেলেবেলা থেকে দৌড়িয়ে অভ্যাস, কিন্তু সাড়ে চার হাত লম্বা লোকের পা তো কম নয়! তা'র হাত থেকে বাঁচা বড়ই শক্ত।

তবুও, প্রাণের দায়ে দৌড়ানো ছাড়া তখন আর উপায় কি? ধানের ক্ষেতের জলের মধ্যে দিয়ে, আলের উপর দিয়ে, চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, রাস্তা দিয়ে, খানাখন্দের মধ্যে দিয়ে—দৌড়ে চলেছি তো চলেছিই। ক্রমেই মেঘনাদ আমাকে ধরে ফেল্‌ছে।

হঠাৎ মেঘনাদের কাকা দেখ্‌তে পেয়ে বে-পরোয়া হয়ে তার কোমরে জড়িয়ে ধর্‌ল। মেঘনাদও বিরক্ত হয়ে "আঃ" ব'লে কাকাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে একটা খড়ের গাদার উপর ফেলে দিল। ভাগ্যে খড় ছিল, নইলে সেদিনই কাকার দফা শেষ হ'তো।

আমাকেই তাড়া কর্‌ল

আমিও ততক্ষণে সুযোগ বুঝে অনেকটা এগিয়ে পড়েছি। কিন্তু, সে আর কতক্ষণ? মেঘনাদও গোটা দশেক দারুণ লাফে আবার অনেকটা এগিয়ে এল। আমি আড়চোখে মাঝে মাঝে পেছনে দেখ্‌ছি

আর প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। দেখ্‌তে পাচ্ছি, মেঘনাদও প্রাণপণে দু'হাত ছুঁড়্‌ছে আর কি-যেন ধর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে।

এইভাবে কতক্ষণ চলেছিল জানি না, কারণ তখন আমার সময়ের জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছিল। সমস্ত গা বেয়ে আমার ঘাম ঝর্‌ছে, শরীর কাঁপ্‌ছে, পা যেন অবশ হয়ে আস্‌ছে, মাথা ঘুরছে, চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে, কান ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে। তবুও যেন অন্যমনস্ক-ভাবে দৌড়িয়েই চ'লেছি।

ক্রমে টের পেলাম, মেঘনাদের কালো ছায়া আমার পেছনেই—এই ধর্‌ল আমাকে। ডান হাতখানা শূন্যে তুলে প্রচণ্ড এক কিল যেন মার্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। আমার তো তখন মাথা একেবারে ঘুলিয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে—"এই বুঝি শেষ!"

শেষটায় আমাকে ধরেই ফেল্‌ল! আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুজ্‌লাম—তখন মেঘনাদের হাতখানা আমার পিঠের উপর পড়্‌ছে।

তারপর,————

আস্তে হাতখানা আমার পিঠে ছুঁইয়ে মেঘনাদ বল্‌ল, "এইবারে! তুমি 'চোর'—ধরে ফেলেছি তোমাকে। এখন ধর দেখি আমাকে!"—

ব'লেই মেঘনাদ চোঁ-চোঁ দৌড়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল—আমিও হাঁপ ছেড়ে বল্‌লাম, "বেজায় বেঁচে গেছি আজ!"

নাম-না-জানা কল

ধাব্‌ধাবাপুরের প্রকাণ্ড ময়দানে মেলা ব'সেছে। বাইরে ফটকের উপর লেখা আছে "বিরাট্ শিল্প-প্রদর্শনী ও মেলা"। কত রকমের জিনিষপত্র এসেছে, কত তামাসার ব্যবস্থা হয়েছে, কত কলকব্জা চারিদিকে সাজান রয়েছে। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার লোক প্রতিদিন মেলা দেখ্‌তে আসে।

এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড কল বসান হয়েছে, তার চারি দিকে উঁচু বেড়া দিয়ে অনেকখানি জায়গা ঘেরা। বেড়ার ফটকে প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড, তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—

"হাজার টাকা পুরস্কার! এই অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য, অতি-আধুনিক কলের নাম যিনি বলিতে পারিবেন তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। দর্শনী মাত্র ৫১০!"

হাজারে হাজারে লোক প্রতিদিন কলটিকে দেখ্‌তে আসে। হ্যাণ্ডবিলে লেখা আছেঃ—"এই কলের নাম কল আপনিই প্রমাণ করিবে—আমাদিগকে কোনরূপ প্রমাণ দিতে হইবে না।

কলের নাম লিখিয়া জানাইবার সময় নিজের নাম ঠিকানা স্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। একজনে একটি মাত্র নাম পাঠাইতে পারেন। দর্শনী অতি সামান্য ; কাজেই, যতবার ইচ্ছা আসিয়া কলটিকে ভালরূপে দেখিয়া যাইতে পারেন। কলের চারিদিকে যে তারের বেড়া আছে তাহার ভিতরে যাওয়া নিষিদ্ধ। কলের কারিকরদের
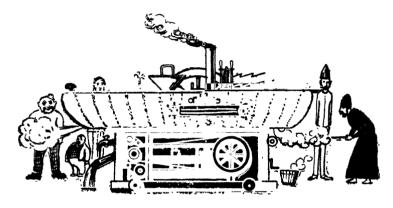
নাম-না-জানা কল

সহিত কথা বলাও নিষিদ্ধ। মেলার শেষ দিনে পুরস্কার ঘোষণা করা হইবে।”

মেলার প্রথম থেকেই কল দেখার জন্য হাজারে হাজারে লোক প্রতিদিন আস্‌তে লাগ্‌ল। একটা হোগ্‌লার চালার নীচে কলটি বসান হয়েছে ; চেহারাও কিম্ভূত কিমাকার। তার ভেতর কত রকমের যে কল-কব্জা আছে তা’ বলা যায় না। উপরে চোঙা,

দুটি ডানার মতনও আছে ; কত চাকা আছে তার হিসাবই নাই ; উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে কেবল চাকা, হ্যাণ্ডিল, বলটু, পাটি, দাঁতী, নল, চোঙা, মিটার ইত্যাদি। কলের আশে পাশে থলে, বাল্‌তি, টিন, বাক্স, বোতল, পিপে—কত কিছু যে রাখা আছে তা' আর কি বল্‌ব। কলের কোন জায়গা কালো, কোন জায়গা সাদা, কোন জায়গা লাল, কোন জায়গা নীল, কোন জায়গা বেগুণী, কোন জায়গা সবুজ, কোন জায়গা হল্‌দে। কলের খানিকটা লোহার তৈরী, খানিকটা তামার, খানিকটা পিতলের, খানিকটা সীসার, খানিকটা কাঠের, খানিকটা সিমেণ্টের, খানিকটা কাপড়ের, খানিকটা কাগজের।

সকালে মেলা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কলটি চল্‌তে আরম্ভ করে আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যায়।

সকলেই খুব মন দিয়ে কলটিকে দেখে আর নাম সম্বন্ধে ফিস্ ফিস্ পরামর্শও চলে। তর্ক-বিতর্কও যথেষ্ট হয়, কারণ কল দেখে বুঝ্‌বার জো নাই কিছুই। কত রকমারি তার আওয়াজ, কত অদ্ভুত তার চলার ভঙ্গি, কত রকমেরই গন্ধ তার ভেতর থেকে বের হচ্ছে, কত ধোঁয়া, কত অদ্ভুত জিনিষই বের হচ্ছে চারিদিক্ দিয়ে। যে লোকগুলো কলে কাজ কর্‌ছে তাদের চেহারা দেখ্‌লে যতই কেন না হাসি পা'ক, তারা নিজে অতি গম্ভীরভাবে কাজ ক'রে চ'লেছে।

প্রতিদিন বড় বড় বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত, প্রোফেসার, ডাক্তার,

সাহিত্যিক, উকিল, মোক্তার, জজ্, দারোগা, এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাদার এঁরা সব তো কল দেখ্‌তে আসেনই, তা' ছাড়া ছাত্র, নিষ্কর্ম্মা লোক, সাধারণ কারিকর ইত্যাদিও হাজারে হাজারে আসেন। যতই কলটিকে পরীক্ষা করা হয় ততই নূতন নূতন নাম মনে আসে।

সেদিন তো প্রোফেসার শমনদমন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার বিপদ্‌বারণ খাস্‌নবিশের রীতিমত তর্কাতর্কিই হয়ে গেল। কলটি চল্‌তে চল্‌তে 'কট্-কট্' 'খট্-খট্' 'ভ-র-র্'—'দুম্' 'দুম্' শব্দ ক'রে তার উপর দিয়ে কিছু ধোঁয়া বের হ'লো আর পাশ দিয়ে সাদা রঙের কি যেন হাল্কা জিনিষ বের হ'লো খানিকটা। শমনদমন বাবু বল্‌লেন, "এটা অটোমেটিক চরকা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না।" বিপদ্‌বারণ বাবু মুচ্‌কি হেসে বল্‌লেন, "বরং তূলো ধোনা কল বল্‌তে পারেন, চর্‌কা হওয়া অসম্ভব। আমার মনে হয় এটা একটা নতুন প্যাটার্নের এরোপ্লেন। ডানা দুটির গড়ন দেখ্‌লে কোন এঞ্জিনিয়ার বল্‌বে না যে এটা এরোপ্লেন নয়। এঞ্জিনের এ রকম 'ভ-র্-র' আওয়াজ শুধু এরোপ্লেনেরই হয়।"

ঠিক এমন সময় আবার কলটি অন্য সুর গাইতে আরম্ভ কর্‌ল। 'কর্‌র'—'কর্‌র' 'ঠ্যাস্'—'ঠ্যাস্'—'দ্রাম্'—'দ্রাম্'—'ঘর্‌র্'—'ঘর্‌র্' শব্দ ক'রে কলের মধ্যে কি যেন চিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্‌ল আর সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো গুঁড়ো জিনিষ একটা থলের মধ্যে গিয়ে ভুস্ ক'রে পড়্‌ল। বিপদবারণ বাবু মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "ভেতরে স্পার্ক যখন বের হচ্ছে আর যখন কয়েল (Coil) রয়েছে ভেতরে তখন

একটা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার কল ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না।" শমনদমন বাবু চোখ টিপে অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লেন, "ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় কেবলই খট-মট রকমের নাম ঘুর্‌ছে। সহজ জিনিষটা বুঝি আর মাথায় আসে না? মোটা ভূষি শুদ্ধ আটাগুলো যে বস্তার মধ্যে গিয়ে পড়্‌ল সেটা বুঝি আর আপনার চোখেই পড়্‌ল না? আজকালকার দিনে ভূষিশুদ্ধ আটার বেশী আদর, কারণ তাতে পূরোমাত্রায় ভিটামিন্ থাকে। এটা আধুনিক আটাকল ছাড়া অন্য কিছুই হ'তে পারে না।"

এভাবে তর্ক আরো কতক্ষণ চল্‌ত জানি না। হঠাৎ ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামায় দু'জনেই ছাতা মাথায় দিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

তা'র পরেও প্রতিদিনই হাজারে হাজারে লোক সেই কল দেখ্‌তে আসে আর একশ' রকমের নাম তাদের মাথায় আসে। কলটি দেখে বা তার আওয়াজ শুনে ঘুণাক্ষরে কিছু বুঝ্‌বার জো নাই। কেউ বলে "এটা ছাপার কল," কেউ বলে "ধান-ভাঙা কল," কেউ বলে, "অটোমেটিক তাঁত," কেউ বলে "করাত কল," কেউ বলে "ষ্টিম-রোলার," কেউ বলে "পাম্প করার কল," কেউ বলে "গেঞ্জির কল", কেউ বলে "মাখন-তোলা কল," কেউ বলে "কাগজের কল," কেউ বলে "পেরেক তৈরীর কল," কেউ বলে "বরফ-কল"।

একটা ছেলে রোজই কল দেখ্‌তে আসে আর দূরে থেকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। দুনিয়ার যত কল আছে, সবেরই নামের

সে একটা ফর্দ্দ বানিয়েছে, কিন্তু তার একটা নামও পছন্দ হয় না ; সে শুধু মুণ্ডু নেড়ে বলে, "ওরকম নাম হ'তেই পারে না !" সকলেই সেই ছেলেকে "হাঁদারাম" বলে, আর সকলেই তা'কে নিয়ে ঠাট্টা করে। সে কিন্তু দম্‌বার পাত্র নয়। প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত সে প্রত্যেক দিন ফর্দ্দ হাতে নিয়ে হাঁ ক'রে কলের দিকে আর লোকের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। তার মুখে কেউ একটিবারও হাসি দেখ্‌তে পায় নি ; শুধু শেষের দিনে সে একবার একটু মুচ্‌কি হেসে একখানা কাগজে কি-যেন লিখে কলের মালিকের হাতে দিয়ে দিল।

মেলার শেষ দিনে সন্ধ্যার পর সেই কলের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হয়েছে ; আর পাঁচ মিনিট পরেই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। সকলেই উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে, এমন সময় কলের মালিক একখানা উঁচু টেবিলের উপর উঠে গুরুগম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণ ! আপনাদের সহানুভূতি ও ধৈর্য্যের জন্য ধন্যবাদ। ১,২৫,৫৭৫টি নাম পড়া বড় সহজ নয়। তাহার মধ্যে একজন মাত্র কলের ঠিক নাম বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার নাম—শ্রীরামধন পোদ্দার ; ঠিকানা—ছাগ্‌লাপাড়া, গর্দ্দভপুর। ইঁহাকেই ১০০০৲ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

অমনি সকলে বল্‌তে লাগ্‌ল, "রামধন পোদ্দার কে রে ?" "লোকটার তো খুব বুদ্ধি !" "দ্যাখ্‌ তো কোন্‌ লোকটা ; একবার চোখে দেখা দরকার তা'কে।"

খানিক বাদেই দেখা গেল একটা লোক ভিড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এগিয়ে আস্‌ছে আর বল্‌ছে, "রাস্তা ছাড়ুন মশায়! পুরস্কার আন্‌তে যেতে হবে।"

ও হরি! এ যে সেই "হাঁদারাম!" শেষটায় কিনা এই লোকটা পুরস্কার পেলো!—আরে রাম! রাম! রাম!—কিন্তু, তা' বল্‌লে কি হবে? লোকটা তো কলের নামটা ঠিকই ব'লেছে!

হ্যাঁ হ্যাঁ—! কলের নামটা বলা হয় নি! নামটি হচ্ছে—"ভিড়-জমানো কল।"

এই নামটিই যে কলটার উপযুক্ত নাম সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? এর প্রমাণও কি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় নি?

পিস্তলের গুলি

বল্‌বন্ত সিং ছেলেবেলায় আমাদের ক্লাসে পড়্‌ত। তার বাড়ী পাঞ্জাবে; বেশ সুপুরুষ চেহারা; লম্বায় তখনই সাড়ে পাঁচ ফুট ছিল। তারপর আর তার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নি,—প্রায় ১৫।১৬ বছর কেটে গেছে। দু'জনে খুবই বন্ধুতা ছিল বটে; কিন্তু তার ঠিকানা আমার জানা না থাকায়, আর আমার ঠিকানাও তার জানা না থাকায় দু'জনে চিঠি লেখালেখি চলে নি।

সেবার পূজোর ছুটিতে পাঞ্জাব বেড়াতে যাই। লাহোরে আমার বিশেষ বন্ধু বিজয় ঘোষ ওকালতী করে; তারই বাড়ীতে ওঠা স্থির হয়। লম্বা রাস্তা, যেন আর ফুরোয়ই না; ঠাণ্ডাও বেশী পড়েনি তখনও। ট্রেণ তখন লাহোরের কাছাকাছি এসেছে; আমি ক্লান্ত হয়ে একটু ঝিমাচ্ছি। হঠাৎ দরজা খুলে একটি লোক কামরায় ঢুকে পড়্‌ল আর সাম্‌নে আমাকে দেখে "আরে!" ব'লে আমার কাঁধে হাত দিল। চম্‌কে চেয়ে দেখি বল্‌বন্ত সিং আমার সাম্‌নে।

তখনই আমি সরে গিয়ে বল্‌বন্ত সিংকে পাশে বসালাম আর

সঙ্গে সঙ্গে কুশল প্রশ্ন ইত্যাদি চল্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌বন্ত বল্‌ল, "আমি স্কুল ছেড়ে পাঞ্জাবে চ'লে আসি; এখানের ইউনিভার্সিটিতে

চেয়ে দেখি বল্‌বন্ত সিং

আই-এস্‌-সি পাশ ক'রে কৃষি-বিদ্যা শিখ্‌বার জন্য এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজে ভর্ত্তি হই। সেখান থেকে পাশ ক'রে কিছুদিন সরকারী

চাকরী করি। সম্প্রতি সে চাকরী ছেড়ে নিজে চাষবাস করার মতলব করছি। চার বছর হ'লো আমার বাবা মারা গেছেন; তাঁর সব সম্পত্তির অধিকারী আমিই। লাহোর থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে কিষণপুরে আমার দু'হাজার বিঘে জমি আছে; সেখানেই আমি থাক্‌ব স্থির করেছি। জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর; সেখানকার দৃশ্যও বড় চমৎকার। অসুবিধার মধ্যে, ৩০ মাইল গরুর গাড়ীতে যেতে হয়; তবে আমি ঘোড়ার টঙ্গার ব্যবস্থা করছি। তোমাকে ভাই একবার আমার ওখানে যেতেই হবে; কিছুতে ছাড়্‌ছি না।"

আমি বল্‌লাম, "বন্ধু বিজয় বাবু যদি নিতান্ত নারাজ না হন, নিশ্চয়ই যাব। তোমার ঠিকানাটা দাও ভাই; আমার ঠিকানাটাও লিখে রাখ।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে ট্রেণ লাহোরে পৌঁছিয়ে গেল। ষ্টেশনে বিজয় এসেছিল; তার সঙ্গে বল্‌বন্ত সিংএর আলাপ করিয়ে দিলাম। বিজয় বল্‌বন্তকে অনেক পীড়াপীড়ি কর্‌ল তার বাড়ীতে থাক্‌বার জন্য; বল্‌বন্ত কিছুতে রাজী হ'লো না; সে সরাইখানাতে গিয়ে উঠ্‌ল। সেখান থেকে রোজই সে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে; অনেক গল্প-গুজব হয়। তিনদিন পর যখন আমার লাহোর দেখা শেষ হ'লো, তখন বল্‌বন্ত বল্‌ল, "এবার আমার ওখানে যেতে হচ্ছে ভাই। বিজয় বাবুকে নিয়ে কাল দুপুরের গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে হার্‌বন্‌ওয়ালা ষ্টেশনে পৌঁছাব। রাত্রে ওয়েটিং রুমে ঘুমিয়ে ভোর বেলা রওয়ানা হ'য়ে ১১টার মধ্যে কিষণপুর পৌঁছাব। আমিও অনেক দিন সেখানে

যাইনি। কাল সেখানকার জমাদারের চিঠি পেলাম; আমাকে চিঠি পেয়েই যেতে লিখেছে। হার্‌বন্‌ওয়ালায় ঘোড়ার টঙ্গার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।”

পরদিন খাওয়া দাওয়ার পর আমি, বিজয় আর বল্‌বন্ত ১২টার ট্রেণে রওয়ানা হয়ে পড়্‌লাম। সন্ধ্যার সময় হার্‌বন্‌ওয়ালায় পৌঁছে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত্তিরটা কাটালাম।

ভোর বেলা উঠে, চা খেয়ে, আমরা ঘোড়ার টঙ্গায় রওয়ানা হয়ে পড়্‌লাম। রাস্তা বেশ পরিষ্কার, ধূলো-বালি নাই বেশী। জঙ্গল মাঝে মাঝে রয়েছে, ছোট পাহাড়ও বিস্তর আছে। পথে এক জায়গায় ঘোড়া বদল হ'লো; সেখান থেকে কিষণপুর ১৫ মাইল। বেলা ১০½টায় আমরা বল্‌বন্তের সম্পত্তির দরজায় পৌঁছালাম।

গাড়ী থেকে নেমে যা' দেখ্‌লাম তা'তে আমার মনে বড়ই আনন্দ হ'লো। চারিদিক সুন্দর গাছপালায় সবুজ হয়ে আছে; পিছনে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, একটি ছোট নদীও বয়ে যাচ্ছে। বাগানের মাঝে একটি ছোট্ট বাংলো ধরণের বাড়ী। উঁচু থামের উপর তিনটি কাঠের ঘর, তার চারিদিকে বারান্দা; কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুক্‌তে হয়। ঘরের উপরে লাল টালির ছাত, ঘরের রং সবুজ। দূর থেকে সুন্দর ছবির মত দেখায়।

আমরা পৌঁছাবামাত্র বল্‌বন্তের জমাদার বুড়ো নিরঞ্জন সিং দৌড়ে এসে সকলকে সেলাম কর্‌ল। তার বয়স প্রায় ৭০ বছর, কিন্তু শরীর খুব সবল আছে। লম্বায় প্রায় সাড়ে চার হাত; ধব্‌ধবে সাদা

দাড়ি-গোঁফ। মুখে কিন্তু তার ভয়ের চিহ্ন। আমাদের বারান্দায় বস্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে সে খাবার আন্‌তে গেল।

সকলকে সেলাম কর্‌ল

খেতে ব'সে আমরা নিরঞ্জনের কাছে যে ঘটনা শুন্‌লাম তা'তে আমাদের মন অনেকটা দমে গেল। সে বল্‌ল যে কিষণপুরের ঐ

বাগানে নাকি অনেকদিন থেকে ভূতের বাস। সে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করে নি, এবং প্রথমে কিছুদিন ভূতের নাম-গন্ধও ছিল না। শেষে শুন্‌তে পেল যে, ভূত নাকি শরৎকালে চাঁদনী-রাতে দেখা দেয়। প্রথমে সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিন দিন আগে যা' সে নিজের চোখে দেখেছে তাতে ভূতকে আর অবিশ্বাস করা চল্‌তে পারে না।

তিন দিন আগে সন্ধ্যার পর সে দক্ষিণের বারান্দার উপর বসে ছিল। সেদিন শুক্লপক্ষের একাদশী; সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে। কতক্ষণ বসেছিল তার মনে নাই। বাগানের মালী শার্দ্দূল সিং সঙ্গে ছিল। দু'জনে গল্প কর্‌তে কর্‌তে সবেমাত্র একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হ'লো যেন সোঁ। সোঁ। শব্দে ঝড় উঠেছে। চম্‌কে সাম্‌নে চাওয়া মাত্র দেখ্‌তে পেল প্রকাণ্ড একটা সাদা মূর্ত্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে তাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে। দু'জনেই উঠে ঘরে পালাবার চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু একটু দূরে গিয়েই মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল। তারপর কি হ'লো মনে নাই। অনেকক্ষণ পরে যখন তাদের চেতনা হ'লো তখন দেখ্‌ল যে ভোর হয়ে গেছে, আর তা'রা দু'জনেই ঘরের দরজার সাম্‌নে পড়ে আছে। সেদিন থেকে ভয়ে তা'রা রাত্রে ঘরের ভিতর শোয়, কিন্তু ভূত আর সেদিন থেকে আসে নি। এর আগেও নাকি একটি লোক ঐ দক্ষিণের বারান্দা থেকে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাতে ঠিক ঐ রকমের ভূত দেখ্‌তে পেয়েছিল। নিরঞ্জন সিং সাহসের জন্য বিখ্যাত; লড়াইয়ে সে

অনেক মেডেলও পেয়েছে। কিন্তু সেদিনের ভূত তা'কে ভয়ে একেবারে কাবু ক'রে ফেলেছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বাগানে বেড়াতে গেলাম আর পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল রাত্রে কি করা যায়। বল্‌বন্ত ভূতে বিশ্বাস মোটেই কর্‌ত না; আমি আর বিজয়ও অনেকটা সাহসী ছিলাম; কাজেই ভূতের ভয়ে আমরা পিছ্-পা হ'লাম না। পরামর্শ ক'রে ঠিক কর্‌লাম সেই রাত্রেই (সেদিন পূর্ণিমা) আমরা তিনজনে দক্ষিণের বারান্দায় শুয়ে থাক্‌ব; বল্‌বন্তের হাতে পিস্তল থাক্‌বে; আমার কাছে বন্দুক থাক্‌বে। ভূত দেখ্‌লেই তা'কে গুলি কর্‌ব।

গল্প-গুজব, বেড়ান, চা খাওয়া, রাত্রের খাওয়া ইত্যাদি সার্‌তে রাত ৮টা বাজ্‌ল। ততক্ষণে দক্ষিণের বারান্দায় আমাদের বস্‌বার জন্য গালিচা আর তাকিয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে; আমরাও খাওয়া দাওয়া সেরে দিব্য আরামে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে গল্প-গাছা কর্‌তে লাগ্‌লাম, আর মাঝে মাঝে দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে আর গাছপালার দিকে নজর দিতে লাগ্‌লাম। চমৎকার জ্যোৎস্না, দিব্য ফুর্‌ফুরে বাতাস, সুন্দর ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে, তার উপর পথের ক্লান্তি—কাজেই ঘুম আর কতক্ষণ আট্‌কা থাকে? ক্রমেই আমাদের তন্দ্রা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। বল্‌বন্ত সিং কিন্তু তখনও সজাগ।

কিছুক্ষণ বাদে বিজয় আর আমি একরকম ঘুমিয়েই পড়্‌লাম; বল্‌বন্তও ঝিমাতে লাগ্‌ল;—হঠাৎ ঝড়ের মত সোঁ সোঁ আওয়াজ হ'লো আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পেলাম দক্ষিণ দিক্ থেকে প্রকাণ্ড

একটা সাদা মূর্ত্তি শূন্যপথে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটে আস্ছে। আমি বন্দুক উঠাতে চেষ্টা কর্লাম ; হাত কেঁপে বন্দুক প'ড়ে গেল। বল্বন্ত দুড়ুম ক'রে পিস্তল ছাড়্ল, কিন্তু মূর্ত্তির কিছুই হ'লো না। আমরা তিনজনেই উঠে ঘরের দিকে ছুটতে চাইলাম কিন্তু মাথা ঘুরে তিনজনেই প'ড়ে গেলাম।

যখন চেতনা হ'লো তখন দেখ্লাম ভোর হয়ে এসেছে। মাথা তখনও যেন ঘুর্ছে। আগের রাতের ঘটনা সব স্বপ্নের মত মনে হ'তে লাগ্ল।

সকালে চা খেয়ে আমরা তিনজনে আগের রাতের ঘটনার বিষয় আলোচনা কর্তে বস্লাম। মূর্ত্তিটা যে কি রকম ছিল তা' স্পষ্টভাবে কা'রো মনে নাই ;—শুধু আব্ছায়া গোছের মনে আছে। ঝড়ের শব্দটা তিনজনেই এক সঙ্গে শুনেছি কি না তা'ও ঠিক বোঝা গেল না ; তবে মোটামুটি এই বোঝা গেল যে, প্রথমে তিনজনেরই মাথা ঘুরেছিল, তারপর তন্দ্রার ভাব এসেছিল, তা'র কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের শব্দ শোনা গেছিল।

সেদিন রাত্রে কি করা হবে সে বিষয়ে আমরা ঠিক ক'রে নিলাম। বল্বন্ত বল্ল, সে দক্ষিণের বারান্দায়ই থাক্বে ; আমি থাক্ব পশ্চিমের বারান্দায়, বিজয় থাক্বে দক্ষিণের ঘরে। প্রত্যেকের হাতেই পিস্তল থাক্বে ; মূর্ত্তি দেখা দিলেই 'ঐ ঐ' ব'লে প্রত্যেকে অন্যদের জানিয়ে দেবে। ঝড়ের শব্দ শোনা গেলেও জানাবে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি, গল্প-গুজব ক'রে কাটিয়ে রাত্রে আমরা

কথা-মত যে-যার জায়গায় বস্‌লাম আর কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ বাদে বল্‌বন্ত ঝিমাতে লাগ্‌ল; বিজয় আর আমি গল্প কর্‌তে লাগ্‌লাম। হঠাৎ বল্‌বন্ত চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল 'ঐ-ঐ-ঐ-ঝড়'; একটু বাদেই আবার বল্‌ল, 'ঐ-ঐ-মূর্ত্তি';—ব'লেই দুড়ুম্ ক'রে পিস্তল ছেড়ে দিল। আমরা কিন্তু ঝড়ও শুন্‌লাম না, মূর্ত্তিও দেখ্‌লাম না।

ছুটে গিয়ে বল্‌বন্তকে দু'জনে ধ'রে টানাটানি ক'রে পশ্চিমের বারান্দায় নিয়ে এলাম; তখনও সে অজ্ঞান হয় নি, কিন্তু টল্‌ছে। খানিকক্ষণ বাতাস করার পর তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল; তখন সে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌ল, ঝড়, মূর্ত্তি এ সব আমরা টের পেয়েছি কি না। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা দু'জনে ঝড়ের শব্দ একটুও শুনি নি, মূর্ত্তিও দেখি নি। মাথাটা খুব সামান্য ভার মনে হয়েছিল; আর কিছুই টের পাই নি। অথচ, আমরা তিনজনেই একদিকে চেয়ে ছিলাম।

সারারাত আমি এ বিষয় ব'সে ভাব্‌লাম। ছেলেবেলা থেকে সায়েন্স্ পড়ার সখ আছে; দু'চারটা পুঁথিও নাড়াচাড়া ক'রেছি, কাজেই এ বিষয়ের একটা বৈজ্ঞানিক মীমাংসার কথা মাথায় ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। বিজয় আর বল্‌বন্ত এটাকে একটা ভৌতিক কাণ্ড ব'লেই ধ'রে নিল। বল্‌বন্ত স্পষ্টই বল্‌ল, "এতদিনে আমার ভূতে বিশ্বাস জন্মাল। চোখের দেখা তো আর অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না!"

সকালে উঠে বিজয় আর বল্‌বন্ত বাগানে বেড়াতে গেল; আমি

আর তাদের সঙ্গে গেলাম না; চুপচাপ একটু তদন্ত কর্‌বার চেষ্টায় বাড়ীর দক্ষিণ দিকে গেলাম। থামের উপর বাড়ীটি তৈরী করা হয়েছে; সেই থামের গায়ে সুন্দর লতা বেয়ে উঠেছে; তা'তে কেমন সুন্দর সোণালী ফুল ফুটেছে; তার গন্ধই বা কি সুন্দর! একটি লতা একটু নূতন ধরণের। তার পাতার রং লালচে গোছের; একটি মাত্র প্রকাণ্ড বেগুনি ফুল সেই লতায় ফুটেছে। ফুলটি বারান্দার রেলিংএর গায়; সকালবেলা আধ-ফুটো অবস্থায় রয়েছে। এমন সুন্দর ফুল আমি খুব কমই দেখেছি।

দক্ষিণ দিকের শোভাটা এত সুন্দর যে আমি ভূতের বিষয় তদন্তের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। চারিদিক্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার বারান্দার দক্ষিণ দিকে উঠে গেলাম; ইচ্ছা, সেই ফুলটি ভাল ক'রে দেখি। কাছে গিয়ে দেখলাম ফুলটি দূরে থেকে যত সুন্দর, কাছ থেকে আরও অনেক বেশী সুন্দর দেখায়। ফুলের গায়ে কি সুন্দর কাজ করা! কাছ থেকে ফুলের গন্ধটিও খাসা। রাত্রে যে গন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল সে এই ফুলেরই গন্ধ।

একটু বাদেই ফুলের গন্ধে আমার মাথাটা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল— আমি চট্ ক'রে সরে এলাম। তখনই কাণের মধ্যে একটু সোঁ সোঁ আওয়াজ হ'লো, আর চোখের সাম্নে একটা সাদা গোছের পর্দ্দার মত জিনিষ দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ বাতাসে বসার পর আবার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভূতের ব্যাঁপারও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন বুঝ্‌লাম,

ঐ ফুলের গন্ধেই আমাদের নেশার মত হ'তো আর তা'রই ফলে ঝড়ের শব্দ, মূর্ত্তি দেখা, এ সব আমরা শুনতাম এবং দেখতাম। নেশা ক্রমে ঘোর হ'য়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলত এবং অজ্ঞান হবার অল্পক্ষণ আগেই চোখের সামনে ঝাপসা শাদা মূর্ত্তি দেখা যেত। আমরা কেউ মূর্ত্তিটি আবছায়া গোছের ছাড়া স্পষ্ট দেখি নি এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেটি মিলিয়ে যেত; তার পর চেতনা থাকৃত না। সেই ফুলের লতা নাকি বল্‌বন্তের বাবার এক বিশেষ বন্ধু হনলুলু থেকে এনেছিলেন। ফুলের দোষ-গুণ তিনি জানতেন না; তার অপরূপ চেহারা দেখেই লতাটি অনেক টাকা দিয়ে কিনে, খুব যত্ন ক'রে ভারতবর্ষে এনে বল্‌বন্তের বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। আগের দিন বাগানে বেড়াবার সময় বল্‌বন্ত ঐ ফুলের লতার কথা আমাকে ব'লেছিল। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাতে ফুল ফুট্‌ত।

সেদিন রাত্রে আমি দক্ষিণের বারান্দায় থাক্‌ব ঠিক কর্‌লাম; বল্‌বন্ত থাক্‌বে পশ্চিমের বারান্দায়, বিজয় দক্ষিণের ঘরে।

রাত্রে আমরা যে-যার জায়গায় ব'সে গল্প করতে লাগ্‌লাম। আমি মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে সেই বেগুনি ফুলটি থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখেছি আর তা'র দিকে নজরও রেখেছি। জ্যোৎস্না দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফুলটি আস্তে আস্তে ফুটে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছি, আর সঙ্গে সঙ্গে তার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

বুঝ্‌লাম, বেশী দেরি করা উচিত হবে না; তাই হঠাৎ 'ঐ-ঐ' ব'লে চেঁচিয়ে, চট্ ক'রে উঠে ফুলটিকে ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিলাম;

সঙ্গে সঙ্গে দুড়ুম্ ক'রে পিস্তলও ছেড়ে দিলাম। তার পর আস্তে আস্তে হেঁটে বল্‌বন্তের কাছে গিয়ে বল্‌লাম, "দেখ্‌লে না, ভূতকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌লাম ?" বল্‌বন্ত ভয়ে কাঁপ্‌ছিল। আমার কথা শুনে বল্‌ল, "ভূত আমি দেখ্‌তে পাই নি ; তবে তা'কে মেরে ফেলেছ শুনে নিশ্চিন্ত হ'লাম্।" আমি বল্‌লাম, "চল যাই ঘুমাই গিয়ে।"

পরদিন সকালে উঠেই আগে আমি বাগানে গিয়ে সেই ফুলটি দেখ্‌তে গেলাম। গিয়ে দেখি, ফুল একেবারে শুখিয়ে গেছে। তখনই তা'কে মাটিতে পুঁতে ফেল্‌লাম। তার পর সেই লতার শিকড়টি টেনে উপ্‌ড়িয়ে ফেলে দিলাম ;—যা'তে আর না গজায়। আশে-পাশে বেশ ক'রে খুঁজে দেখ্‌লাম সেই লতা আর আছে কিনা —দেখ্‌লাম একটিও নাই।

সে রাত্রে আমরা তিনজনেই দক্ষিণের বারান্দায় রইলাম। রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠ্‌ল ; ফুরফুরে বাতাস বইল ; চমৎকার ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল—কিন্তু, সেদিনের গন্ধটা যেন একটু অন্য ধরণের। বল্‌বন্ত বল্‌ল, "ভূত পালাবার সঙ্গে সঙ্গে কি ফুলের গন্ধও বদ্‌লে গেল ?" আমি শুধু "হুঁ" বল্‌লাম। সে রাত্রে আর ভূত দেখা দিল না ;—এমন কি, তখন থেকে নাকি সেখানে ভূত আর দেখাই দেয় নি। এর জন্য বল্‌বন্ত আমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ; সে বল্‌ল, "পিস্তল তো অনেকেই ছোঁড়ে ; কিন্তু, তোমার মত অব্যর্থ হাত কা'রো নাই।"

কুঁড়ের কীর্ত্তি

নটু বড় কুঁড়ে ছেলে। বয়স মাত্র দশ বছর, কিন্তু, এরই মধ্যে তার কুঁড়েমি ধরেছে আশী বছরের বুড়ো মানুষের মত। কত বকুনি খায়, কত তাকে বোঝান হয়—কত শাস্তিও পায়, তবু তার স্বভাব বদ্‌লায় না কিছুতেই। সকালে ঘুম থেকে উঠ্‌তে তার আটটা বেজে যায়; স্কুলে যেতে ১১টা বেজে যায়; তাও আবার কোন কোন দিন স্নানই হয় না। বিকালে বাড়ী ফিরে আর তার কোথাও যাওয়া হয় না; এক চোট আরাম ক'রে ঘুম না দিলে চলে কেমন ক'রে? সন্ধ্যার সময় মাষ্টারমশাই পড়া'তে আসেন; তাঁকেও আধ ঘণ্টা ব'সে থাক্‌তে হয়, তারপর নটু বাবু আস্তে ধীরে ন'ড়ে চ'ড়ে পড়্‌তে আসেন। পড়্‌তে ব'সেও কেবলই তা'র হাই ওঠে। ঘণ্টাখানেক বাদে মাষ্টার চ'লে যান্ আর নটু বাবুরও খাবার সময় হয়ে যায়। খাওয়াটা মায়ের হাতেই হয়; নিজে মেখে খাবার উৎসাহও তার নাই। খাওয়ার পর—বাস্! বিছানায় শুয়ে গাঁ গাঁ ঘুমিয়ে রাত কাবার কর্‌লেই হ'লো।

এই ভাবে চল্‌তে চল্‌তে নটুর পড়াশুনা ক্রমেই গোল্লায় যেতে লাগ্‌ল—ক্লাসে সে সকলের নীচে থাকে; একটাও অঙ্ক পারে না; একটা পড়াও বল্‌তে পারে না। বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, গাধার টুপি মাথায় দেওয়া হয়;—দু'একটা চড়-চাপড়ও খায়; কিন্তু স্বভাব আর শোধ্‌রায় না। বেঞ্চির উপর, গাধার টুপি
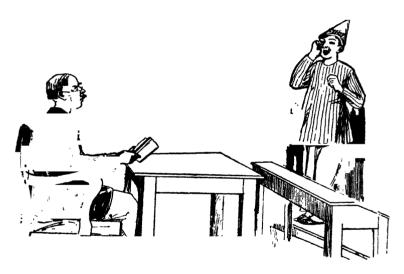
বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়েও সে হাই তোলে

মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়েও সে হাই তোলে আর ঘুমে ঢোলে মাষ্টার-মশাইরা হার মেনে গেছেন তার ব্যাপার দেখে।

নটুদের বাড়ীতে সেদিন একজন নামজাদা সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি নটুকে দেখে আর তার কাণ্ড শুনে বল্‌লেন, "কুঁড়েমির শাস্তি অতি গুরুতর। আজ থেকেই যদি প্রাণপণ চেষ্টা না কর তা' হ'লে চিরদিন কষ্ট পাবে—'কাল থেকে চেষ্টা করব' মনে কর্‌লে কখনও চেষ্টা করা হবে না।"

সন্ন্যাসী চ'লে যাবার পর নটুর কাকা বল্‌লেন, "শুন্‌লে তো নটু, সন্ন্যাসী বাবাজী কি বল্‌লেন? কথাটা মনে লেগেছে কি না?" নটু একটু হাই তুল্‌ল—মুখে কিছুই বল্‌ল না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নটুর মামা এসে নটুর বাবাকে বল্‌লেন, "আজ আমার খুড়্‌তুতো ভাইএর বিয়ে; নটুকে আমি আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।"

বাবার হুকুম পেয়ে নটু মামার সঙ্গে বাসে চড়ে শ্যামবাজারে মামার বাড়ী রওয়ানা হ'লো। সেখানে যেতে যেতেই সে অনেকবার ঘুমে ঢুলে পড়্‌ল।

মামার বাড়ী পোঁছে বিয়ের হৈ চৈ গোলমালে, বরযাত্রী হয়ে যাওয়ার স্ফূর্ত্তিতে নটুর আর কুঁড়েমি ধরে নি। বিয়ের খাওয়াটাও বেশ ভাল রকমই হয়েছিল—লুচি, মাংস, চপ, কাট্‌লেট, ছানার ডালনা, চাট্‌নি, দৈ, রাবড়ি, মিঠাই, আম—কিছুই আর বাদ পড়ে নি। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তে প্রায় রাত বারোটা বেজে গেল। নটুও ঘন ঘন হাই তুল্‌তে লাগ্‌ল।

মামা এসে নটুর অবস্থা দেখে বল্‌লেন, "আজ বড় রাত হয়েছে;

এখন আমাদের বাড়ীতে গিয়েই ঘুমাও; কাল ভোরে তোমাকে বাড়ী পোঁছে দেবো।"

সে রাত্তিরটা মামার বাড়ীতেই নটু শু'ল বটে, কিন্তু ঘুমের আরামটা আর হ'লো না। রাত্তিরে একটার পর ঘুমিয়ে, ভোরের বেলা ৫ টার সময় মামা এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন—তখনই নাকি বাড়ী রওয়ানা হ'তে হবে। নটু আর করে কি? ঘন ঘন হাই তুল্‌তে তুল্‌তে জুতো জোড়া পায়ে দিয়েই মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়্‌ল।

বাড়ী থেকে অল্প দূরেই রাস্তা দিয়ে বাস্‌ চলে। সেখানে গিয়ে সে মামার সঙ্গে একটা বাসে উঠে পড়্‌ল। মস্ত বড় বাস্‌, দিব্যি নরম গদি; চলেও বেশ সুন্দর—কোন ঝাঁকানি নাই। অন্য কোন লোক তখনও সেই বাসে ওঠে নি; তা'রা দুজনই সেই বাসের যাত্রী।

বাসের কণ্ডাক্টার (যে টিকিট দেয়) ঘন ঘন চেঁচাচ্ছে—"শেয়ালদা—মৌলালী—ধর্ম্মতলা—কালীঘাট—আলীপুর!" নটুও ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে।

বাস্‌টা চল্‌ছে তো চল্‌ছেই—পথ আর শেষ হয় না। কণ্ডাক্টারও চেঁচাচ্ছে তো চেঁচাচ্ছেই;—"শেয়ালদা—মৌলালী—ধর্ম্মতলা—কালী-ঘাট—আলীপুর—চিড়িয়াখানা"—"চিড়িয়াখানা"—"চিড়িয়াখানা"!

হঠাৎ নটু দেখ্‌ল তার ক্লাসের একটা ছেলে সেই বাসে উঠ্‌ল। ছেলেটা সর্ব্বদাই বাঁদরামী করে। নাম তা'র 'গোপেশ্বর', ডাক নাম 'গোপী';—কিন্তু সকলেই তাকে 'কপি' ব'লে ডাকে।

ছেলেটা বাসের এক কোণায় গিয়ে বসে রইল ; নটুর দিকে ফিরেও তাকা'ল না।

আরেকটু দূরে গিয়ে তা'র ক্লাসের আরো কয়েকটি ছেলে উঠ্‌ল। তারাও 'কপি'র পাশে গিয়ে বস্‌ল। তাদের মধ্যে ছিল 'নবীন'— বেজায় কালো আর মোটা—তা'কে সকলেই 'ভাল্লুক' বলে। আর ছিল অরুণ—খুবই চালাক আর ধূর্ত্ত—দেখ্‌লেই বুঝা যায়। তা' ছাড়া ছিল—দেবেন আর সতীশ। দেবেন ছিল তিড়িক্কি মেজাজের— কিছু বল্‌লেই ফোঁস্ ক'রে ওঠে। সতীশ ছিল বেজায় রাগী ও ষণ্ডা— সকলে তা'কে 'বাঘা সতীশ' বল্‌ত।

বাস্‌টি তাদের নিয়ে বেশ জোরেই চল্‌তে লাগ্‌ল—কণ্ডাক্টারও চেঁচাতে লাগ্‌ল—"চিড়িয়াখানা, আলীপুর, চিড়িয়াখানা"—

নটু কিছু বুঝ্‌তেই পার্‌ছে না কোথায় যাচ্ছে। মামার ভয়ে কিছু বল্‌তেও পার্‌ছে না—পাছে ধমক খায়।

খানিক বাদে বাস্‌খানা হঠাৎ ফস্ ক'রে আলীপুরের চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে ৫।৬টি ষণ্ডা লোক লাঠি হাতে ক'রে লাফিয়ে বাসে চ'ড়ে পড়্‌ল। তাদের একজনের হাতে একটা ফর্দ্দ ; তা'তে কি যেন সব লেখা আছে—নটু ভাল ক'রে পড়্‌তে পার্‌ল না।

একটু বাদে বাস্‌টা একটা বাড়ীর কাছে গিয়ে থাম্‌ল ; তারই গায়ে লাগা বড় বড় কয়েকটি খাঁচাও রয়েছে। অম্নি সেই লোক-গুলোর মধ্যে একটা বিশ্রী চেহারার খোঁট্টা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"গাবেব

হৌস্‌”! ফর্দ্দ হাতে লোকটা ব'লে উঠ্‌ল,—“হাঁ হাঁ! গোপেশ্বর ঘোষ—ওরফে ‘কপি’!”

আর যাবে কোথা! চার পাঁচটা লোক মিলে তখনই গোপেশ্বরকে লাঠির গুঁতো দিয়ে বাস্‌ থেকে নামিয়ে সটান্‌ একটা খাঁচার মধ্যে পূরে দড়াম্‌ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে তালা লাগিয়ে দিল। গোপেশ্বর কত দোহাই-দস্তুর কর্‌ল—কে তা'র কথা শোনে? আবার লোকগুলো বাসে চড়্‌ল আর বাস্‌ও ছেড়ে দিল। নটু মনে মনে হেসে বল্‌ল, “যেমন বাঁদরামী করে তেম্নি তার শাস্তি! বাঁদরের ঘরে থেকে এবার বাঁদরামী কর!”

আবার বাস্‌ থেমে গেল আর ফর্দ্দহাতে লোকটা ব'লে উঠ্‌ল, “নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ওরফে ‘ভাল্লুক’!” অম্নি ৪।৫ টা লোক নবীনকে নামিয়ে একটা ভাল্লুকের খাঁচায় পূরে ফেল্‌ল। নটু মনে মনে বল্‌ল, “যেমন ভাল্লুকের মত চেহারা—তা'রই ফল।”

আবার একবার বাস্‌ থাম্‌ল আর অরুণকে নামিয়ে একটা শেয়ালের খাঁচায় পোরা হ'লো। দেবেনকে পোরা হ'লো একটা কেউটে সাপের খাঁচায়; সতীশকে বাঘের খাঁচায় পোরা হ'লো। নটু তো হেসেই বাঁচে না। মনে মনে বল্‌ল, “যেমন স্বভাব, তার তেম্নি ফল।”

খানিক বাদে আবার বাস্‌ থাম্‌ল আর সেই সর্ব্বনেশে ফর্দ্দওয়ালা লোকটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—“শ্রীমান নটু—ওরফে—কি বলা যায় হে?”—ব'লে সেই খোঁট্টাটার দিকে তাকিয়ে রইল। খোঁট্টার

চেহারা দেখ্‌লে রাগে পিত্তি জ্বলে যায়। মুখে ন্যাকামীর হাসি, একটা চোখ আবার টেপা হচ্ছে!

খোঁট্টা বল্‌ল, "Aye-Aye" ("আয়-আয়") ইয়ে Sloth—নেহি তো উল্লু।" অম্নি সেই ৪।৫ টা লোক তাকে মামার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সটান্ একটা ছোট্ট খাঁচায় পূর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। খাঁচার বাইরে লেখা ছিল "Indian Owl" অর্থাৎ, 'দেশী পেঁচা'। খাঁচাটা তার পক্ষে নিতান্তই ছোট আর বিচ্ছিরি নোংরা, অন্ধকার স্যাঁৎস্যাঁতে, দুর্গন্ধ। নটু তো ভয়ে আড়ষ্ট; কিছু বল্‌বারও সাহস হচ্ছে না তার। তা' ছাড়া তা'র মধ্যে তা'কে ঢোকানও মুস্কিল হচ্ছিল; কিন্তু, লোকগুলো নাছোড়বন্দা; জোর ক'রে ঠেলে-ঠুলে তা'কে সেই খাঁচায়ই ঢোকাবে। নটু কাঁদ্‌তে যাচ্ছিল;—একটা লোক অম্নি একটা রুমাল তার মুখে গুঁজে দিয়ে চেপে ধর্‌ল। তারপর আবার খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি ক'রে খাঁচায় ঢোকাবার চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল। নটুর মুখ শুকিয়ে গেছে, ঝর্ ঝর্ ক'রে ঘাম ঝর্‌ছে, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, ধস্তাধস্তির চোটে সারা গায়ে বেদনাও হয়ে গেছে—কিন্তু কিছুই করার জো নাই। মামাও তো কোন খোঁজ নিলেন না তার—আচ্ছা মামা যা' হোক্। বাড়ী গিয়ে মামার কীর্ত্তি ব'লে দেবে ভাব্‌ল, কিন্তু বাড়ীই বা যায় কেমন ক'রে? রাস্তাও কিচ্ছু চেনা নেই, পয়সাও একটি নাই সঙ্গে—আর ছাড়াই বা পায় কেমন ক'রে?

লোকগুলোর মাথায় কোন বুদ্ধি আস্‌ছে না কেমন ক'রে নটুকে

খাঁচায় ঢোকায়। ধস্তাধস্তির চোটে তাদেরও ঘাম বেরিয়ে গেছে কারণ তা'রা সকলেই বেশ মোটা মানুষ; তাই তা'রা একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কর্‌ছে; শুধু একজনে নটুকে খাঁচার দরজার সঙ্গে চেপে রেখেছে। হঠাৎ খোঁট্টাটা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "আরে, ইয়ে তো চিড়িয়া নেহি হ্যায়; ইয়ে তো জানোয়ার হ্যায়,—নিকালো—নিকালো।"

তাড়াতাড়ি লোকগুলো নটুকে টেনে বার কর্‌ল—নটুও হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। কিন্তু, নিস্তার আর নাই। খোঁট্টাটা তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে লোকগুলোকে বল্‌ল, "লে চলো উস্‌কো!" লোক-গুলোও তাকে চ্যাংদোলা ক'রে আর একটা খাঁচার কাছে নিয়ে গেল। এবারের খাঁচাটা তবুও অনেক বড় আর যথেষ্ট উঁচু—মন্দের ভাল। খাঁচার বাইরে লেখা আছে—"Sloth or Aye-Aye"। নটু কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ল না কি জন্তু। শ্লথ বা আই-আই এক জাতের কুঁড়ে জন্তু—রাতদিনই গাছের ডাল আঁকড়ে ধ'রে বসে থাকে।

খাঁচার মধ্যে নটুকে ঢুকিয়েই ৩।৪ জনে তাকে তুলে ধর্‌ল, আর সাম্নের একটা গাছের ডালে তাকে হাত-পা দিয়ে আঁক্‌ড়ে ধ'রে ঝুলে থাক্‌তে বল্‌ল। সর্ব্বনাশ! নটুর মত কুঁড়ে ছেলে কস্মিন্‌কালেও গাছে চড়ে নি, বা জিম্‌নাষ্টিকও করে নি; সে অমন ভাবে ঝুল্‌বে কি ক'রে? বল্‌তে যাচ্ছিল, "পার্‌ব না"—কিন্তু মুখে যে তার রুমাল গোঁজা, হাতও যে নাড়াতে পার্‌ছে না। তাই সে একটু মাথা নেড়ে

'না' বল্‌ল। ফর্দ্দ হাতে লোকটা ব'লে উঠ্‌ল, "না পার তো বয়ে গেল! দাও ওকে ছেড়ে! অত উঁচু থেকে পাথরের মেজেতে

ডালটা জড়িয়ে ধ'রে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল

পড়্‌লে ওর অর্দ্ধেক হাড়গোড়ও আস্ত থাক্‌বে না,—তখন বুঝ্‌বে বাছাধন! ছেলের আব্দারও কম নয়; শ্লথ হয়ে গাছে ঝুল্‌তে চান্‌ না! দাও ওকে ছেড়ে—মজাটা বুঝুক!—"

নটুর জীবনে এমন কাজ কখনও সে করে নি। লোকগুলো হাত ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে খপ্ ক'রে ডালটা জড়িয়ে ধ'রে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। অবস্থা বেজায় সঙ্গিন, কিন্তু উপায়ও নাই। আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তার পর অন্য বুদ্ধি দেখা যাবে।

নটুর ঐ রকম অবস্থা দেখে লোকগুলোর দয়া হওয়া দূরের কথা, হাসির চোটে তা'রা ঘর ফাটিয়ে দিল। ফর্দ্দওয়ালা লোকটা ব'লে উঠ্‌ল, "আই-আই হবার মজাটা বুঝুক এবারে বাছাধন! ব'লেছিলাম কুঁড়েমি ছাড়্‌তে—তা'র জবাব দিলেন কিনা মস্ত এক হাই তুলে! থাকো এবার ঝুলে!"—

ওমা! এ যে সেই সন্ন্যাসী! পোষাক বদ্‌লিয়ে একেবারে চেনা যাচ্ছিল না তাঁকে। নটু ভাব্‌ল হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইবে, কিন্তু হাতই বা ছাড়ে কেমন ক'রে, মুখে গোঁজা রুমালই বা বের করে কেমন ক'রে? শুধু করুণ দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে দেখ্‌ল একবার।

কে বা তা'র কথা ভাবে, কে বা চায় তা'র দিকে? লোকগুলো গম্ভীরভাবে দরজায় তালা লাগিয়ে চ'লে গেল; নটু ঐ অবস্থায়ই ঝুল্‌তে লাগ্‌ল।

ঐ ভাবে সে ঝুল্‌ছে তো ঝুল্‌ছেই। গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে গেল, ঝর্ ঝর্ ক'রে ঘাম ঝর্‌তে লাগ্‌ল, হাতের জোর ক্রমেই ক'মে আস্‌তে লাগ্‌ল, মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কতক্ষণ এই ভাবে ছিল কিছু সে জানে না—হঠাৎ

তার মাথা গুলিয়ে গেল, হাত-পা অবশ হয়ে গেল—সে ঝুপ্‌ ক'রে ডাল থেকে প'ড়ে গেল!

—পড়্‌ল একেবারে বিছানার উপর! চোখ চেয়ে দেখে তা'র মামা সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন—"বাবা! এ যে কুম্ভকর্ণকে হার মানায়। বাসে যে ঘুমা'ল তো ঘুমা'লই; জাগে আর না। বহু কষ্টে টেনে-টুনে নামালাম; আঁক্‌ড়ে যে ঝুলে রইল, ছাড়েই আর না। ঠিক যেন সেই 'আই-আই' জন্তু—গাছের ডাল ধ'রে ঝুল্‌ছে।"

নটু মুখে কিছু বল্‌ল না, কিন্তু সেদিন থেকে তার কুঁড়েমি যে কোথায় গেল কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ল না। সবাই বল্‌ল, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ বৃথা যায় না।"
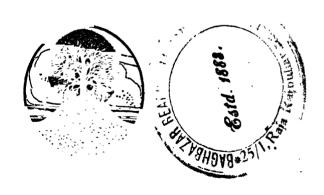
বারবেলা

বড়দিনের ছুটি। পরীক্ষাও হয়ে গেছে ; স্কুল খুল্‌লে প্রমোশন হবে। এ কয়দিন কোন ভাবনা-চিন্তা নাই, পড়াশুনাও নাই ; কাজে-কাজেই দুপুরে একটু বিশ্রাম করার ইচ্ছা হয়। সেদিন বিকালে ছুঁকোটোলার ময়দানে মেলা দেখ্‌তে যাবার কথা ; তারপর সন্ধ্যা ৬টায় আমাদের ক্লাসের নীলমাধব তপাদারের কাকার বাড়ীতে বায়োস্কোপ আর ম্যাজিক দেখার আর রাত্রে সেখানে ভোজের নেমন্তন্ন। নীলমাধবের কাকা প্রভঞ্জন তপাদার সিঙ্গাপুরে ডাক্তারী করেন ; বিস্তর টাকা। তাঁর একটি খান্‌সামা আছে, সে নাকি ফরাসী দেশে থেকে রান্না শিখেছে—তা'কে নাকি তিনি পঁচাত্তর টাকা মাইনে দেন্। প্রভঞ্জন বাবুর খাওয়াবার সখটাও খুব। কাজেই রাত্রে ভোজের ব্যাপার যে ভাল-রকম হবে সেটা বলাই বাহুল্য।

প্রভঞ্জন বাবুর ছেলে নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল ; তাই সেদিন সে আমার মামার বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে বল্‌ল, "দয়া ক'রে

পাশের বাড়ী থেকে ভ্যাব্‌লাকে ডেকে দিন্ না।" (ভ্যাবলা আমার ডাক নাম)। আমি টেলিফোন ধর্‌তেই সে বল্‌ল, "পরশু রাত্রে আমাদের বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন রইল—আস্‌তে হবে কিন্তু ভাই। আর, সন্ধ্যা ৬টায় বায়োস্কোপ আর ম্যাজিক হবে; তা'তেও তোমার নেমন্তন্ন। আমাদের টেলিফোনের নম্বরটা টুকে নাও। যদি আস্‌তে পার তো ৫।৷০ টায় ফোন্ ক'রো, মোটর পাঠিয়ে দেবো।" আমি "আচ্ছা" ব'লে তা'র টেলিফোন নম্বরটা জিজ্ঞাসা ক'রে দেওয়ালে লিখে রেখে দিলাম;—পাছে হারিয়ে ফেলি।

কখন সেই 'পরশু' আস্‌বে দু'দিন শুধু তাই ভেবেছি। সেদিন বিকালে মেলা দেখে প্রভঞ্জন বাবুর বাড়ী যাব ঠিক ক'রেছি। তাঁরা থাকেন সহরের অন্য মাথায়; কাজেই তাঁদের মোটরে সেখানে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই; আমি বাড়ীও চিনি না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে-মাত্র একটু বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছি—মতলবটা, এক্‌চোট ঘুমিয়ে নিই—এমন সময় কে যেন ডাক দিল "ভ্যাব্‌লা!" মনে কর্‌লাম নিরঞ্জন, তাই ছুটে নীচে গেলাম। গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাশের নরেশটা দাঁত বের ক'রে হাস্‌ছে। তখন যা' রাগটা হ'লো!—ঘুমটা একেবারেই মাটি!

আমাকে দেখেই নরেশ বল্‌ল, "আজ হুঁকোটোলার মেলায় যাবি নাকি ভাই? চল্ না, আমিও যাব।" আমি বল্‌লাম, "খেয়ে দেয়ে আর কাজ নাই; এই দুপুর রোদে মেলায় যাব কোন্ দুঃখে? তা'ছাড়া, বেলা ৩টা পর্য্যন্ত 'বারবেলা', 'যাত্রা নাস্তি' পঞ্জিকায়

লিখেছে। তিনটের আগে কিছুতেই আমি বেরুচ্ছি না। শেষটায় রাত্রের বায়োস্কোপ, ম্যাজিক, দারুণ ভোজ, সবই মাটি হোক্ আর কি! মেলা দেখ্‌তে বড় জোর একটি ঘণ্টা; যেতে আস্‌তে আধ ঘণ্টা!"

নরেশ বেচারা আর করে কি? সে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে চল্‌ল। আমি তা'কে ডেকে বল্‌লাম, "যাস্ না ভাই; আয় ততক্ষণ একটু গল্প করি; পৌনে তিনটার সময় বেরোবার ব্যবস্থা করা যাবে—কি বলিস্ ভাই?"

আড়াইটা পর্য্যন্ত তো গল্প করা গেল; তারপর, হঠাৎ আমার মনে হ'লো, নিরঞ্জনরা তো বেজায় সাহেব; তাদের বাড়ীতে সাহেবী পোষাক প'রে যাওয়াই ভাল। তখনই চট্ ক'রে উঠে, বাক্স থেকে কোট, প্যাণ্ট, টাই, সার্ট বের ক'রে নিয়ে পর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। তিনটের আগেই পূরো-দস্তুর সাহেব সেজে, টুপি মাথায় দিয়ে মেলার পথে রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌লাম। নরেশকে দেখে মনে হ'লো আমার সঙ্গে যেতে যেন তার লজ্জা হচ্ছে।

মেলায় পৌঁছে দেখ্‌লাম খুব ভিড় জমেছে। সব চেয়ে বেশী ভিড় জমেছে একটা গোলক ধাঁধার সাম্‌নে। সেখানে মস্ত বড় সাইন্-বোর্ডে লেখা রয়েছে—

"প্রোফেসার গোলকচাঁদের গোলক ধাঁধা।

বিংশ-শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দশ মিনিটের মধ্যে বাহিরে আসিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ২৫৲ টাকা পুরস্কার। প্রবেশিকা মাত্র ৵০ আনা।"

এক পাশে দেখ্‌লাম, কতগুলো লোক একটা সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে গোলক ধাঁধার একটা জানালার দিকে চেয়ে হাসাহাসি কর্‌ছে আর ভিতরের লোকদের ঠাট্টা ক'রে হাততালি দিচ্ছে। নরেশ যাচ্ছিল সেদিকে দেখ্‌তে; আমি তা'কে ধমক্ দিয়ে বল্‌লাম, "দেখ্‌বার আর জিনিষ পাও নি! বেচারারা ফাঁপড়ে পড়েছে; তাই নিয়ে আবার ঠাট্টা ;—ছিঃ—!"

নরেশ বল্‌ল, "তবে চল এখান থেকে; অন্য তামাসা দেখি গিয়ে; পাঁচটা তো বাজে প্রায়।" আমি বল্‌লাম, "নাঃ! পঁচিশটে টাকা ছাড়া যায় না। দশ মিনিট ছেড়ে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌ব। গোলক ধাঁধার পথ বের কর্‌তে আমি ওস্তাদ।"—একথা ব'লেই আমি গোলক ধাঁধার ফটকে দুই আনা দিয়ে ঢুকে পড়্‌লাম; নরেশ বাইরেই রয়ে গেল।

প্রথমেই একটা ছোট কাম্‌রা; তার মধ্যে খুব উজ্জ্বল আলো; তারপর গোলক ধাঁধার ভিতরের রাস্তা। কাম্‌রায় একটা ঘড়ি রয়েছে, আর একটা খাতায় নাম লেখা হচ্ছে। আমি আমার নামটি খাতায় লিখ্‌লাম আর অম্‌নি কাম্‌রার মধ্যের একটি ভদ্র-লোক বল্‌লেন, "পাঁচটা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিট দশ সেকেণ্ড—যান্, ঢুকে পড়ুন।" আমিও ঢুক্‌লাম, ভদ্রলোকটিও সময়টা টুকে নিলেন। ঠিক ঢুক্‌বার মুখেই একটি মোটা ভদ্রলোক ঘেমে ঝুল হ'য়ে বেরিয়ে এলেন, আর কাম্‌রার ভদ্রলোকটি তাঁকে দেখে বল্‌লেন, "আদিত্যনাথ চক্রবর্ত্তী?—আপনার এক ঘণ্টা সাত মিনিট

লেগেছে।" আমি ভাব্‌লাম, যেমন মোটা লোক, বুদ্ধিও তেম্নি মোটা ; না হ'লে কি আর এক ঘণ্টা সাত মিনিট লাগে ?

গোলক ধাঁধার পথটি অন্ধকার ; চোখে অতি কমই দেখা যায়। আমিও খুবই সাবধানে চল্‌লাম। খানিকটা গিয়ে বাধা পেলাম, আবার ফির্‌লাম, অন্য পথে গেলাম, আবার খানিকটা গিয়ে বাধা পেলাম, আবার একটু ফিরে একটা চৌমাথায় এলাম। যাঁহাতক্ আসা, অম্‌নি মাথার উপর দপ্ ক'রে উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ জ্বলে উঠ্‌ল, আর আমার চোখ একেবারে ঝল্‌সে গেল। অনেক কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম—আবার একটা চৌমাথায় এসে ঐ রকম ঘট্‌ল। এই রকম ৩।৪ বার ঘটার পর আমার মনে হ'লো গোলকধাঁধার প্রায় মাঝামাঝি এসেছি। ইতিমধ্যে একবার মনে হ'লো, যেন সেই জানালাটার পাশ দিয়ে চ'লে গেলাম,—পোলের ওপর থেকে যেটার দিকে লোকেরা দেখ্‌ছিল আর হাত-তালি দিচ্ছিল। তখন আর ও সব দেখ্‌বার সময় ছিল না—আমি কেবল মাঝখানে যাবার জন্য ব্যস্ত।

খানিক বাদেই টের পেলাম একটা বড় কাম্‌রায় এসে পোঁছে গেছি—সেটাই গোলক ধাঁধার মাঝখান। কাম্‌রার মাঝখানে একটা তক্তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"এমনি সংসার পথ ধাঁধায় ভ্রমণ,
যে পায় প্রকৃত পথ সে-ই বিচক্ষণ।"

সেখানে একটি লোক ব'সে ছিল, সে আমার নাম জিজ্ঞাসা

করল। আমি নাম বল্‌তেই সে টেলিফোনে বাইরের কাম্‌রার ভদ্রলোকটিকে ব'লে দিল, ওমুক বাবু মাঝে পৌঁছিয়েছেন। মাঝের কাম্‌রায় ঘড়ি ছিল, সেটা না কি বাইরের ঘড়ির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক মেলানো। সেটাতে দেখ্‌লাম, আমার ঠিক ছয় মিনিট লেগেছে ভেতরে ঢুকতে। ভাব্‌লাম, বাইরে বেরুতে তা'র অর্দ্ধেকের বেশী সময় লাগ্‌তেই পারে না। পাশে একটি বুড়ো ভদ্রলোক হাঁড়িমুখ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি বল্‌লেন, "দেখ্‌ছ কি সাহেব? বেরোতে ঠেলাখানা বুঝ্‌বে এখন। আমি সাত মিনিটে ঢুকেছিলাম; এক ঘণ্টা বেরুতে চেষ্টা ক'রে আবার মাঝখানে ফিরে এসেছি। চার আনা পয়সা দিলে নাকি বের হবার পথ এঁরা দেখিয়ে দেবেন;—তবে, এক ঘণ্টার আগে নয়, আর চোখ বেঁধে বের ক'রে দেবেন। এ পর্য্যন্ত পাঁচ শো পঁচাত্তর জন লোক হিমসিম খেয়ে গেছে। সাহেব বুঝি শুধু ঘুঘুই দেখেছ, ফাঁদটি আর দেখ নি!"

আমি বুড়োর কথায় ততটা মনোযোগ না দিয়ে চট্ ক'রে বের হবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌লাম। পিছনের রাস্তাটা ধ'রে কিছুদূর গিয়ে আবার মাঝখানেই ফিরে এলাম; আবার অন্য রাস্তা ধ'রে কিছুদূর গিয়ে দেখ্‌লাম সাম্‌নেটা বন্ধ; খানিকটা ফিরে অন্য রাস্তা ধ'রে আবার দেখ্‌লাম সাম্‌নে বন্ধ; আবার অন্য রাস্তা ধ'রে খানিকটা গিয়ে দেখি আবার মাঝখানেই পৌঁছে গেছি। তখন যা' রাগটা হ'লো! আবার চেষ্টা কর্‌লাম বের হ'তে; সাতবার সাম্‌নে বাধা পেয়ে যখন রাগটা চড়্‌তে আরম্ভ করেছে

তখন দেখি সেই জানালাটার সাম্নে পৌঁছেছি। মনে হ'লো একটু আগেই একবার জানালাটার সাম্নে দিয়ে গেছিলাম—আবার মনে হ'লো যাই নি। যা' হোক্, একটু এগিয়ে বাঁয়ে একটা রাস্তা পেলাম, সেটা দিয়ে খানিকটা গিয়ে দেখি আবার সেই জানালার পাশে! তখন রাগে আমার গা জ্বলে গেল। সাম্নে একটা টুপি পড়ে ছিল, তাতেই দিলাম এক লাথি। টুপিটা দেয়ালে লেগে আমার পায়ের কাছেই এসে পড়্‌ল। আর কিছুর উপর রাগ ঝাড়্‌তে না পেরে এক লাফে টুপির উপর প'ড়ে দিলাম তা'কে চ্যাপ্টা ক'রে একেবারে থেত্‌লিয়ে। লাফাবার সময় নিজের মাথার টুপিটা হাত দিয়ে সাম্‌লাতে গিয়ে দেখি—ও মা! মাথা যে খালি! আমারই টুপি আমি পা দিয়ে থেত্‌লিয়ে দিয়েছি। কি আর করা যায়? মানে মানে রওয়ানা হওয়াই ভাল। বাইরের লোকগুলো পোলের উপর থেকে আমার কাণ্ড দেখে হো হো ক'রে হেসে হাত-তালি দিয়ে উঠ্‌ল। একজন বল্‌ল, "বা রে সাহেব! আবার নাচ হচ্ছে!" নরেশের মত গলায় কে যেন বল্‌ল, "সাড়ে পাঁচটা কিন্তু বাজে!"—তখন রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু, সাড়ে পাঁচটা বাজে শুনে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না—দৌড়ে আগে যেতে লাগলাম। সাম্‌নেই দেখি এক বুড়োকে চোখ বেঁধে একটা দরোয়ান হাত ধ'রে নিয়ে চলেছে। বুঝ্‌লাম, এ সেই বুড়ো, যে আমায় ঠাট্টা করেছিল। তাড়াতাড়ি তার পিছু ধর্‌লাম! পা টিপে চলার দরুণ দরোয়ানও কিছু টের

পেল্ না ; আমিও অল্পক্ষণের মধ্যে নির্ব্বিবাদে বেরিয়ে এলাম। এসেই আর কথাবার্ত্তা নেই, সটান্ সেই পোলের কাছে !

নরেশ বল্‌ল,—"চল যাই ; সময় হয়েছে !" আমি বল্‌লাম,
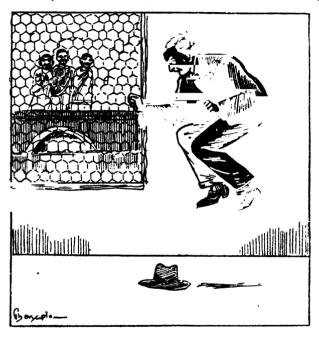
চ্যাপ্‌টা ক'রে থেত্‌লিয়ে দিলাম

"একটু দাঁড়া ভাই ; জান্‌লা দিয়ে ভেতরের লোকগুলোকে দেখা যাক্।" ঠিক সেই সময় একজন ভদ্রলোক জানালার সাম্‌নে দিয়ে গেলেন, আমি তাঁকে দেখেই, "দুয়ো ! দুয়ো !" ব'লে হাততালি

দিলাম। পোলের উপরের দুটি লোক আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "ওরে, সেই সাহেব রে!"—আমি মানে মানে প্রস্থান কর্‌লাম! তখন ঠিক সাড়ে পাঁচটা।

উর্দ্ধশ্বাসে মামার বাড়ীর দিকে ছুট্‌লাম। সেখানে পৌঁছেই টেলিফোনের ঘরের দিকে গেলাম। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ঠেলাঠেলি কর্‌তে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল, "একটু দাঁড়ান্; এখনই খুল্‌ছি।"

একটু বাদেই দরজা খুলে দু'জন রাজমিস্ত্রি বেরিয়ে এল; তাদের হাতে পোঁচ্‌ড়া আর চূণের বাল্‌তি। ঘরে ঢুকে দেখি, সর্ব্বনাশ! এই মাত্র ঘর চূণকাম করা হ'লো; দেয়ালে লেখার নামগন্ধও নাই। টেলিফোনের নম্বরটা যে লিখে রেখেছিলাম তার চিহ্নও নাই। এখন করা যায় কি?

ছুটে নীলমাধবদের বাড়ী গেলাম; তাদের সঙ্গে যদি যেতে পারি। গিয়ে শুন্‌লাম তা'রা ৫ মিনিট হ'লো রওয়ানা হয়েছে; বাড়ীতে চাকর ছাড়া আর কেউই নাই; সেও নিরঞ্জনদের বাড়ী জানে না।

কি আর করি? হেঁটে বাড়ী পানে রওয়ানা হ'লাম। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পার হবার সময় একটা প্রকাণ্ড সবুজ মোটর সাম্‌নে দিয়ে "ভঁ—আঁ—আঁ—প্‌" ক'রে হর্ণ বাজিয়ে চ'লে গেল আর আমার নতুন ইস্তিরি করা প্যাণ্টে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেল। রাগে আমার গা জ্বলে গেল। বাড়ীর এত কাছে এসে কিনা এই কাণ্ড!

বাড়ী পৌঁছা'বা মাত্র রামা চাকরটা বল্‌ল, "দাদাবাবু! এই মাত্তর একটা সবুজ মোটর গাড়ী এয়েছিল; আপনাকে নিয়ে যাবার তরে, ন্যারঞ্জুন বাবু নাকি গাড়ী পাঠিয়েছিলেন। আমি বল্‌লুম, 'দাদাবাবু বেইরে গেছেন'।"

তখন আর আমার বুঝতে বাকি রইল না কোন্ সবুজ মোটর এসেছিল, আর কেই বা 'ন্যারঞ্জুন বাবু'। রাগটা যা হ'লো! বারবেলা কেটেই তো গেছিল; তবে কেন এমন হ'লো?

অমাবস্যার অন্ধকারে

অমাবস্যার রাত, চারিদ্দিকে ঘোর অন্ধকার। ছাতে ব'সে আমি আর অরুণ গল্প কর্‌ছি, এমন সময় 'ভ্‌—র—র্‌—র' ক'রে একটা আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম। প্রথমে খুব দূরে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল; ক্রমে আওয়াজটা ঠিক মাথার উপরে এল। খানিকক্ষণ ঐ ভাবে থেকে আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। দু'তিন বার এই ভাবে আওয়াজ এল আর মিলিয়ে গেল। আকাশ এত অন্ধকারে ঢাকা ছিল যে ব্যাপারখানা কিছুই বোঝা গেল না।

আমাদের বাড়ীটা ছিল ছোট গলির মধ্যে; সেখানে রাস্তার আলোও টিম্‌ টিম্‌ ক'রে জ্বলে। গলির বাড়ীগুলোর প্রায় কোনটাতেই তখনও ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট হয় নি। দু' একটি বাড়ীতে গ্যাসের আলো জ্বলে; অন্যগুলিতে কেরোসিনের লণ্ঠন, ল্যাম্প্‌ কিম্বা কুপির ব্যবস্থা। কাজেই অমাবস্যার মেঘাচ্ছন্ন রাতে সে পাড়ায় কি রকম অন্ধকার থাকে বুঝ্‌তেই পার। যাক্‌!—

আমরা তো আওয়াজের মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না; মনে কৌতূহল থেকেই গেল। তখনও এরোপ্লেনের দিন আসে নি; কাজেই, এরোপ্লেনের কথা মনে হ'লো না।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘট্‌ল, তাতে আমাদের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। যে রাত্রে আমরা ঐ অদ্ভুত আওয়াজ শুন্‌লাম সেই রাত্রেই মিত্তিরদের রান্নাঘর থেকে এক হাঁড়ি রান্না মাংস হাঁড়ি-শুদ্ধ চুরি গেল, আর তা'র পাশের বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী থেকে এক হাঁড়ি পোলাও উধাও হ'লো। দুই বাড়ীতেই মিষ্টি মিঠাই কিছু কিছু কেনা ছিল; তা'ও চুরি গেল। অথচ, চুরিটা বড় অদ্ভুত রকমে ঘট্‌ল। মিত্তিরদের রান্নাঘরের বাইরের দরজা বন্ধ ছিল; দরজা খোলা হয় নি, অথচ জিনিষ চুরি গেছে। ভেতর দিক্‌ দিয়ে চুরি কর্‌তে হ'লে শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়; সে ঘরে স্বয়ং মেজবাবু তাঁর তিন চারটি ছেলেপিলে নিয়ে গল্পগাছা কর্‌ছিলেন। সেখান দিয়ে যায় কা'র সাধ্যি? ইঁদুর গেলেও ধরা প'ড়ে যেতো। বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীতেও চুরি করা বেশ একটু মুস্কিল। অথচ দুই দুই জায়গায় চোখে ধূলো দিয়ে চোর নির্ব্বিবাদে রান্নাঘর থেকে খাবার জিনিষ নিয়ে চম্পট দিল!

পুলিশে খবর দিয়ে কোন লাভ হ'লো না। দারোগা বাবু তো কোনই কিনারা কর্‌তে পার্‌লেন না। সেই অদ্ভুত আওয়াজের কথা বলাতে তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন, "তোমারই কান বোধ হয় তখন ভোঁ ভোঁ কর্‌ছিল, তাই ও রকম আওয়াজ শুনেছিলে।" আমি চুপ ক'রে রইলাম। প্রতিবাদ ক'রে তো আর কোন লাভ নেই! অরুণ আমার কানে কানে বল্‌ল, "চালিয়াতের কাছে ওসব কথা ব'লে কি হবে? ওর কি মুরদ আছে চোর ধর্‌বার? চেহারাটা

দেখ না; যেন একটা আস্ত ইডিয়ট্ !”—আমরা আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলাম।

তা'রপর প্রায় মাস খানেক হ'য়ে গেছে; চুরির কথা আমরা ভুলেই গেছি। সেদিনও অমাবস্যার রাতে আমরা দু'জন ছাতে ব'সে গল্প করছি, এমন সময় সেই 'ভ্-র্-র্-র্' আওয়াজটা শোনা গেল। আমি আর অরুণ তখনই তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্লাম আর আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্তে লাগ্লাম। অরুণ একটু বাদেই চেঁচিয়ে উঠ্ল, “ঐ-ঐ——ঐ দেখ একটা পাখীর মত কি যেন জিনিষ আকাশে উড়্ছে।” চেয়ে দেখ্লাম, বাস্তবিকই একটা মস্ত বড় জিনিষ আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে তা'র আকারটা ভাল ক'রে বোঝা যাচ্ছে না।

জিনিষটাকে দেখ্তে দেখ্তে সেটা আস্তে আস্তে নীচের দিকে নাম্তে লাগ্ল; তারপর একটা চূড়াওয়ালা বাড়ীর ছাতে নেমে পড়্ল। ছাতে আলো ছিল, তা'ই বাড়ীটা চিন্তে পারা গেল।

আমি আর অরুণ তাড়াতাড়ি ছাত থেকে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্লাম। চূড়াওয়ালা বাড়ীটা আমাদের চেনা ছিল। সে বাড়ীটাতে থাক্তো এক হিন্দুস্থানী—নাম রামভজন পাঁড়ে। লোকটি বেজায় কুঁড়ে, তাই দিন দিন মোটাই হচ্ছিল। কারো সঙ্গে তার বিশেষ আলাপ ছিল না; শুধু দু'একটি ছোট ছেলে সেখানে যাতায়াত করত। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে সেই বাড়ীর দিকেই রওয়ানা হ'লাম। হঠাৎ অরুণ উপরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্ল, “দেখ!

দেখ!”—চেয়ে দেখি, ছোট্ট একটি ছেলে আকাশে ঝুল্‌ছে আর তিড়ং তিড়িং লাফাচ্ছে। একবার ঘোষেদের বাড়ীর ছাতের পাঁচিলে:

ঝুল্‌ছে আর তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে

সে নেমে পড়্‌ল, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশে উঠে পড়্‌ল।

সেই "ভ-র্-র্-র্" আওয়াজটা তখনও শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটা কিছু বোঝা গেল না।

আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই চূড়াওয়ালা বাড়ীর দিকে ছুটে চল্‌লাম। পথে রমেশ আর বিনয়ের সঙ্গে দেখা হ'লো; তাদেরও সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম। যেতে যেতে সংক্ষেপে তা'দের সব কথা ব'লে দিলাম। তা'রাও উৎসাহের সঙ্গে আমাদের দলে জুট্‌ল।

সেই বাড়ীটাতে পৌঁছে দেখি নীচটা ঘুটঘুটে অন্ধকার; সিঁড়িতে একটা পিদ্দিম টিম্-টিম্ ক'রে জ্বল্‌ছে। সদর দরজা ভেজান ছিল; আমরা পা টিপে টিপে ঢুকে পড়্‌লাম। একটু একটু ভয়ও কর্‌ছিল; কিন্তু কেউ আর পিছ্-পা হ'লাম না। বাড়ীর ছাতে আলো ছিল তা' আমরা আগেই দেখেছিলাম; কাজেই বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে ছাতে লোক আছে।

আস্তে আস্তে উঠান পার হ'য়ে দোতালার সিঁড়িতে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। উঠ্‌ছি আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছি—পাছে কেউ পেছন থেকে বা সাম্‌নে থেকে আক্রমণ ক'রে বসে!

দোতালায় উঠে একবার চারিদিক্ দেখে নিলাম—কেউ আছে ব'লে মনে হ'লো না। কাজেই, আস্তে আস্তে তেতালায় উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। তেতালার চিলের ছাতের নীচে পৌঁছে দেখ্‌লাম ছাতের দরজা অর্দ্ধেক ভেজান। দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প আলো আস্‌ছে।

ধরা পড়্‌বার ভয়ে আমরা দরজার আড়ালে রইলাম; শুধু অরুণ আস্তে আস্তে মাথাটা বের ক'রে একবার ছাতে উঁকি মেরে দেখ্‌ল।

তারপর আমাদের হাত দিয়ে ইসারা ক'রে একেবারে ছাতে উঠে পড়্ল। সকলেই তার পিছন পিছন ছাতে পেঁাছে গেলাম।

গিয়ে যা' দেখ্লাম তা'তে আর হাসি চাপা গেল না। দেখি মোট্কা রামভজন স্বয়ং একটি অতিকায় লাটাই হাতে একটা ধাউস্ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। ঘুড়ির সূতো প্রায় দড়ির মত মোটা। সূতো থেকে একটি ছোট ছেলে ঝুল্ছে ; তা'র ঝুল্বার জন্য একটি কপি-কল গোছের ব্যবস্থা। ইচ্ছা কর্লে সে সূতোর সাহায্যে কয়েক হাত ওঠা-নামা করতে পারে। ছেলেটি তখন ছাতের কাছে পেঁাছে গেছে— পাঁড়ে মশাইও লাটাইএর সূতো গুটাচ্ছেন। ছেলের হাতে একটি হাঁড়ি ; সেটি রমেশদের বাড়ীর। সেদিন রমেশদের বাড়ীতে মাংস রঁাধা হচ্ছিল।

আমাদের দেখে পাঁড়েজি যা' চম্কালেন, কি আর বল্ব ! তাড়াতাড়ি লাটাইএর সূতা গুটিয়ে ঘুড়িটা নামিয়ে ফেল্লেন ; ছেলেটিও হাঁড়িটা রেখে দুই পকেট ভর্ত্তি সন্দেশ বের কর্তে লাগ্ল। তখন আর কারো বুঝ্তে বাকি রইল না, সেই 'ভ—র্—র্—র' আওয়াজটাই বা কিসের, আর খাবার চুরিই বা হ'তো কি ক'রে। পাঁড়েজি আমাদের কাছে অনেক মাপ চেয়ে নির্ব্বিবাদে রমেশদের হাঁড়িটা মাংসশুদ্ধ ফেরৎ দিলেন। বেচারার মুখ এত কাঁচু-মাচু হয়েছিল যে, আমরা আর কিছু বল্তে না পেরে অনেক কষ্টে হাসি চেপে বাড়ী রওয়ানা হলাম।

গুপ্তধনের নেশা

কাটনা গ্রামে বহুকালের বনিয়াদী পাকড়াসী বংশ বাস করেন। নরেশ বাবু সেই বংশের লোক; বড় জমিদার; খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি। তাঁর একমাত্র ছেলে সত্যেশ এবার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে।

সত্যেশের কয়েকটি বন্ধু ছেলেবেলা থেকেই তা'র খেলার সাথী; কলেজেও তাদের অনেকে সত্যেশের সঙ্গে পড়ে। কেদার সেন ডাক্তারের ছেলে পরেশ, অনুকূল ঘোষ কণ্ট্রাক্টরের ছেলে বিনয়, ভূষণ চাটুর্জ্জে উকিলের ছেলে অবিনাশ, মহেন্দ্র ঘোষ মোক্তারের ছেলে হেমেন্দ্র, এরা সবাই সত্যেশের অন্তরঙ্গ বন্ধু। লেখাপড়ায় সকলে খুব ভাল না হ'লেও বুদ্ধি নাকি তা'দের খুবই ধারাল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা, ডিটেক্‌টিভ-গিরি করা—এসব নাকি তাদের মাথায় খুব ভাল-রকম খেলে।

বন্ধুদের মধ্যে বিনয়ই পাণ্ডা ; সব কাজে সে বুদ্ধি জোগায়। কেমিষ্ট্রী নাকি তা'র খুব ভালরকম জানা আছে। বাড়ীতে সে নিজের চেষ্টায় ল্যাবরেটারী বানিয়েছে ; সেখানে নানা রকমের আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। সে নাকি গোবর থেকে চিনি, গোঁফের পমেটম্, মুখে মাখার পাউডার বানাবার চেষ্টা কর্‌ছে, মাছের পিত্তি থেকে সাবান বানাবার চেষ্টা কর্‌ছে, ইঁদুরের চর্ব্বি থেকে মুখে মাখ্‌বার 'স্নো' তৈরী করার চেষ্টা কর্‌ছে, বেড়াল তাড়াবার এক আশ্চর্য্য কল বের করেছে, যার মধ্যে বেড়ালকে ছেড়ে দিলে ভয়ে একেবারে আধ-মরা হয়ে যাবে ; তারপর, বাইরে ছেড়ে দিলে বেড়ালভায়া সেই রাজ্যি ছেড়ে চোঁচাচম্পট দেবে।

পরেশ হ'লো "টিক্‌টিকি পুলিশ"—সে যত রাজ্যের খবর নিয়ে আসে। কোথায় কোন্ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘট্‌ছে, কে কবে বিলাত যাচ্ছে, ক্রিকেট-ফুটবলে কোন্ টীম কেমন খেল্‌ছে, কোন্ পালোয়ান এবার 'চ্যাম্পিয়ন' হবে—সব খবর তা'র কাছে পাবে।

হেমেন্দ্র সাহিত্যিক ; সে তা'র সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়েই আছে। আজ "ভেঁপু" কাগজের জন্য কবিতা লিখ্‌ছে, কাল "ঢাক" কাগজের একটা মুখবন্ধ লিখ্‌ছে, পরশু "লেখস্তিকা" কাগজের জন্য ছোট গল্প লিখ্‌ছে।

অবিনাশ হ'লো "আর্টিষ্ট", রাতদিন সে তার খাতা আর পেন্সিল নিয়েই আছে। যত রাজ্যের 'স্কেচ্' আর 'কার্টুন' আর লতাপাতা এঁকে সে তার খাতা ভরিয়ে রেখেছে। তা' ছাড়া, বাড়ীতে তা'র

আঁকার সরঞ্জাম, রং, তুলি, বোর্ড, কাগজ, ইত্যাদি রয়েছে ;—ঝুড়ি ঝুড়ি ছবিও আঁকা রয়েছে। খোদাইএর কাজেও সে খুব ওস্তাদ।

সত্যেশ বেচারা ভাল মানুষ ; সে বিনয়ের এসিষ্ট্যাণ্ট হয়েই সন্তুষ্ট ; সময় পেলেই বিনয়ের ল্যাবরেটরীতে গিয়ে সে হাজির হয়। মাঝে মাঝে সত্যেশদের বাড়ীর বৈঠকখানায় তাদের বৈঠক বসে আর নানান্ বিষয়ে আলোচনা হয়। নরেশবাবু খুব মিশিয়ে লোক ; তিনিও মাঝে মাঝে তাদের খবর নেন্ আর লুচি, আলুর দম্, মাল্পোয়া, পায়েস, মিঠাই ইত্যাদি খাওয়াবার ব্যবস্থা করেন,—কাজেই, তাদের আড্ডাটা বেশ ভালরকম জমে।

কাটনায় আর একটি লোক বাস করত যা'র কথা সকলেই বলত। লোকটির নাম পঞ্চানন পোদ্দার ;—ছোটখাট, রোগা, বেঁটেপানা, আধ বুড়ো লোকটি ; স্বভাব অতি নিরীহ। কিন্তু, এর সম্বন্ধে একটি গুজব শোনা গিয়েছিল —এর নাকি রাশি রাশি গুপ্তধন আছে। কোথায় রেখেছে কেউ জানে না ; জিজ্ঞাসা করলেও হেসে উড়িয়ে দিত। কেমন ক'রে এ ধন পেল তা'ও কেউ জানে না। সামান্য জমিজমা নিয়ে রামধন বাস করে ; সাধারণ লোকের মত থাকে, খায় দায়।

পঞ্চানন পোদ্দার

পঞ্চাননের ছেলে রামধন পোদ্দার বেজায় সাহেব। লেখাপড়া খুব বেশী করে নি, তাই বড় চাকরী তা'র জোটে নি। কল্কাতায়

নাকি অনেক সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ ; তা'রা তা'কে 'Ramsden' ব'লে ডাকে। নিজের নাম সই করে Ramsden Podder (র্যাম্‌স্‌ডেন পডার)।

এজ্‌রা ষ্ট্রীটের ফারগুসন কোম্পানীর আপিসে রামধন ৩০৲ টাকা মাইনেতে কেরাণীর কাজ কর্‌ত ; সেই আপিসের বড় সাহেব জাঞ্জিবারে (আফ্রিকা) একটি আপিস খুলে সেখানে একটি লোক পাঠাতে লেখে। পঞ্চানন পোদ্দারের সঙ্গে আপিসের বড়বাবুর চেনা ছিল ; ধ'রে ক'য়ে ছেলের জন্য কাজটি জুটিয়ে দেয়। মাইনে ২০০৲ টাকা, যাবার ভাড়া আপিস থেকেই দেবে ।

মিঃ র্যাম্‌স্‌ডেন পডার

এর পর দুটি দুর্ঘটনা হয়। রামধন চাক্‌রি নেবার কয়েকদিন পরই পঞ্চানন হঠাৎ মারা যায়। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বলেন, 'হার্ট ফেল' করেছে ; লোকে বলে এটা ভূতের কাজ। রামধন বাপের শ্রাদ্ধ ক'রে জাঞ্জিবার রওয়ানা হ'য়ে যাওয়ার ৩।৪ দিন পরই খবর এল জাহাজডুবি হ'য়ে রামধনও মারা গেছে। এটাও লোকে ভূতেরই কাজ ব'লে ধ'রে নিল ;

পঞ্চানন মারা যাবার পর অনেকেই রামধনকে গুপ্তধনের কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। রামধন সকলকেই ব'লেছিল, "গুপ্তধন যদি থাক্‌বেই তা' হ'লে বিদেশে চাকরী ক'রে মর্‌তে যাব কেন ?" বেচারা

হয় তো "মর্‌তে যাব" কথাটির অন্য কোন অর্থ করে নি ; কিন্তু লোকে বলে রামধন আগে থেকেই জান্‌ত, সে বিদেশে মর্‌তে যাচ্ছে।

রামধন মারা যাবার পর দু'মাস কেটে গেছে। পঞ্চাননের বাড়ী এখন খালি। তার ভাইপো গঙ্গাধর সেদিন এসে বাড়ী খুলে, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করিয়েছে ; কোন কাগজপত্র বা গুপ্তধন পাবার কোন সঙ্কেত সে পায় নি। লোকে বলাবলি করে, রামধনকেই পঞ্চানন নাকি গুপ্তধনের সন্ধান ব'লে দিয়েছিল ; কাজেই এখন আর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

* * * *

একদিন সন্ধ্যায় সত্যেশ তা'র বন্ধুদের সঙ্গে বিনয়ের ল্যাবরেটরীতে ব'সে আছে, এমন সময় পরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির। তা'র চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে উঠেছে, চুল উস্কো খুস্কো ; মুখে কথা নাই। ঘরে ঢুকেই সে ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে ব'লে উঠ্‌ল—

বিনয়

পরেশ বল্‌ল "চু—প্‌"

"চু—প্‌"। দরজাটি আস্তে আস্তে বন্ধ ক'রে সে বন্ধুদের পাশে তক্তপোষের উপর বস্‌ল। পকেট থেকে একখানা খাম বের ক'রে সে আগে চারিদিক চেয়ে দেখে নিল। আমি তাদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতাম, তখনও উপস্থিত ছিলাম। আমাকে পরেশ বল্‌ল, "ভাই, একটু নিরিবিলি কথা এদের সঙ্গে

আছে, আজ একটু মাপ কর্‌তে হবে দাদা!"—আমি বাইরে যাচ্ছিলাম; পরেশই আমাকে বল্‌ল, "একটু তফাতে থাক্‌লেই হবে; বাইরে যাবার কোন দরকার নেই; তোমাকেও পরে সব কথা বল্‌ব।"

পরেশ যে খামটি বের ক'রেছিল তার ভেতর থেকে সে কয়েক টুক্‌রো লম্বা ফালির মত কাগজ বের ক'রে তক্তপোষের উপর সাজা'ল; তারপর বন্ধুরা খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো দেখ্‌তে আর খুব উৎসাহ ক'রে পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌ল। কথা কিন্তু সকলেই চাপা গলায় ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্‌ছিল। আমি শুধু একবার শুন্‌লাম, "গুপ্তধন" একবার শুন্‌লাম, "সন্দেহ নাই;" আর একবার শুন্‌লাম, "বাস্‌! এই রইল!"

পরামর্শ হয়ে যাবার পর পরেশ আমাকে বল্‌ল, "ভাই, ব্যাপারটা বড় গুরুতর; পঞ্চাননের গুপ্তধনের সন্ধান বোধ হয় পেয়ে গেলাম। কাউকে কিছু ব'লো না ভাই;—না আঁচালে বিশ্বাস 'নেই। তবে, একথা নিশ্চয় জেনো যে তোমাকেও কিছু ভাগ দেবো।"

এই ঘটনার তিনদিন পর সন্ধ্যায় বিনয়ের ল্যাবরেটরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি কোদাল গাঁইতীর ছড়াছড়ি—তা'দের নাকি বাগান করার সখ হয়েছে! রাত্রে বাগান করাটা একটা নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার; তা'র দ্বারা নাকি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেছে। সেই জন্য তা'রা অনেকগুলো টর্চ্চলাইটও এনেছে। আমার বেশী সময় ছিল না, তাই রাত্রের বাগান করা দেখা হয়ে উঠ্‌ল না।

একদিন সকালে উঠে শুনি কাটনাময় হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার—
আগের রাত্রে নাকি গ্রামে বাঘ এসেছিল; সত্যেশ আর তা'র
চার বন্ধুকে বাঘে খেয়েছে! সকলেই সত্যেশদের বাড়ীর দিকে
ছুটেছে; সেখানে লোকে লোকারণ্য। আমিও তাড়াতাড়ি সেই দিকে
ছুটে গেলাম।

মনে ক'রেছিলাম, গিয়ে রক্তারক্তি দেখ্‌ব; কিন্তু, তার কিছুই নাই।
বুড়ো হাসান সর্দ্দারকে ডেকে আনা হয়েছে; তা'র মত বড় শিকারী
আর আশেপাশে কোথাও নাই। সে মাটিতে পায়ের দাগ দেখে
বল্‌ল, "বাঘের খোঁজ ক'রে বুড়ো হ'লাম, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত
ব্যাপার জন্মে দেখি নি। বাঘেরা আবার দল বেঁধে গ্রামে শিকার
কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল কবে থেকে? পাঁচটা বাঘের পায়ের দাগ
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অথচ, দাগগুলোও অদ্ভুত গোছের; এমন
চ্যাপ্টা দাগ কখনও দেখি নি!"

সকলেই নানারকম জল্পনা কল্পনা কর্‌ছে, কিন্তু, কাজের কথা
কেউ আর বলে না। নরেশবাবু শেষটায় বল্‌লেন, "আপনারা
কেউ তো দেখ্‌ছি কাজের কথা বল্‌ছেন না। এখন উপায়টা কি
করা যাবে সে কথা কেউ ভেবেছেন?"

কেদারবাবু বল্‌লেন, "দক্ষিণে পাটপাড়ার পর যে খাদ আছে
তার মধ্যে খোঁজ করা দরকার এখনই। সেখানে জঙ্গলও খুব
ঘন, খাদের গভীরতাও খুব বেশী। শুনেছি, সেখানে নাকি অনেক
বাঘ থাকে।"

হাসান সর্দ্দার বল্‌ল, "এ মুলুকে বাঘ বড় একটা আসে-টাসে না ; তবে, এই ঘটনা যখন ঘটেছে, তখন বাঘের খোঁজ কর্‌তে তো হবেই। বাবু যা' বলেছেন আমারও ঠিক তা'ই মনে হয় ; এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মস্ত বড় একটি দল পাটপাড়ার দিকে রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌ল। নরেশবাবু, কেদারবাবু, অনুকূলবাবু, মহেন্দ্র-বাবু, এঁরা সব বন্দুক নিয়ে রওয়ানা হলেন ; হাসান সর্দ্দারকেও একটা বন্দুক দিলেন। গ্রামের অনেক লোক লাঠি, বল্লম, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে সঙ্গে চল্‌ল। সকলকেই ব'লে দেওয়া হ'লো, অস্ত্রের ব্যবহার খুব সাবধানে করে যেন, কারণ বাঘের চেয়ে মানুষের খোঁজটাই হ'লো বেশী দরকারী। যদি এখনও ছেলেদের কেউ বেঁচে থেকে থাকে, তা'কে তো উদ্ধার করার চেষ্টাও কর্‌তে হবে।

প্রথমে বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখে চেষ্টা করা হ'লো। সত্যেশ-দের বাড়ী থেকে কিছুদূর গিয়েই বালির উপর পায়ের চিহ্নগুলি মিলিয়ে গেছে ; তা'র পর আর সে চিহ্ন খুঁজেই পাওয়া গেল না ; আশে-পাশে কোথাও একটিও চিহ্ন নাই। কাজেই আর বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে বাঘেরা বালির উপর দিয়েই পাটপাড়ার জঙ্গলে পৌঁছিয়েছে। আসলে সেটাই ছিল "শর্টকাট"—সোজা রাস্তা। সকলে সেই রাস্তা দিয়েই রওয়ানা হ'লো।

সারাদিন জঙ্গলে পাতি-পাতি ক'রে খুঁজে বাঘের নাম-গন্ধও

পাওয়া গেল না। কোন রকমে বাঘের লক্ষণ দেখা তো গেলই না, বরং হরিণ ইত্যাদির অবাধে চরা দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল যে দু'চার দিনের মধ্যে সেই রাস্তা দিয়ে কোন বাঘ চলা-ফেরা করে নি। আশে-পাশের জঙ্গলও খুঁজ্‌তে বাকি রইল না, কিন্তু কোথাও বাঘের চিহ্ন পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর সকলেই নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল।

ব্যাপারটা আরও রহস্যময় হ'য়ে উঠ্‌ল। বাঘেরা যদি দল বেঁধে এসে থাকে তা' হ'লে তা'রা গেল কোন্ পথ দিয়ে? সত্যেশদের কি কোন হুঁস ছিল না যে বাঘ তাদের ধ'রে নিয়ে গেল, অথচ কোন ধস্তাধস্তি বা রক্তের চিহ্ন রইল না? হয়তো বা তা'রা ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিল। সকালে যখন জানা গেল সত্যেশরা নিরুদ্দেশ, তখন সত্যেশদের বস্‌বার ঘরের বাইরের শিকলটা লাগান ছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তা'রা যখন বাইরে বেরিয়েছিল তখন বাঘ তা'দের ধরেছে। তা'রা ছুটে পালালেই পার্‌ত? কেন পালায় নি তা'রাই জানে। বাইরে বেরিয়ে কেন তা'রা দরজায় শিকল দিয়েছিল? হয়তো তা'রা একটু বেড়া'তে যাবার ইচ্ছা ক'রেছিল।

আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো বা গুপ্তধনের সন্ধান পাবার দরুণ কোনও অভিশাপে তাদের এই রকম রহস্যময় শাস্তি হয়েছে। পঞ্চানন, রামধন এদেরও তো মৃত্যু সন্দেহজনক অবস্থায় ঘটেছে। কথাটা কিন্তু কা'রো কাছে ফাঁস কর্‌বার সাহস হ'লো না আমার। গুপ্তধনের কথা আর কেউ জানে কিনা তা'ও আমি জান্‌তাম না।

রাত্রে সত্যেশদের চাকর রামা আমার কাছে চুপিচুপি এল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "দাদাবাবু, আপনি কি গুপ্তধনের কথা কিছু শুনেছিলেন? আমাদের দাদাবাবুকে পরেশদাদাবাবু কি যেন বল্‌ছিলেন, গুপ্তধন আন্‌তে হবে। আমার তো মনে হয়, তাঁ'রই শাপে কিছু ঘটেছে।" আমি বল্‌লাম, "আমারও তাই মনে হয়।" রামা বল্‌ল, "কিন্তু দাদাবাবু, একটা কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। পাশের ঘরে আমি রাত্রে শুয়েছিলাম; আমি তো একটুও আওয়াজ শুন্‌তে পাই নি। দাদাবাবুরা রাজ্যির জিনিষপত্র ঘরে জড় করেছিলেন, সেগুলোই বা গেল কোথায়? ভূতুড়ে কাণ্ড কিছু বুঝ্‌বার জো নেই।"

সারারাত আমার ভাল ক'রে ঘুম হ'লো না। ভোরবেলা উঠেই সত্যেশদের বাড়ীর দিকে ছুট্‌লাম। সেখানে গিয়ে দেখি একটি চাষা একখানা রুমাল নিয়ে এসেছে, সেটা নাকি সে কাট্‌নার উত্তরে একটি মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছে। রুমালে 'B' লেখা আছে;—বিনয়ের রুমাল সেটা। কাজেই উত্তরের দিকে খুঁজ্‌বার ব্যবস্থা তখনই ক'রা হ'য়ে গেল। অন্যান্য দিকেও এক একটি দল রওয়ানা হ'লো। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে, একটু জল-খাবার খেয়ে উত্তরের দলের সঙ্গে রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌লাম। পথে রামার সঙ্গে দেখা হ'লো, সে আমাকে কি জানি বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু বল্‌ল না আর।

কাট্‌না থেকে চার মাইল দূরে বাঘপাড়ার ময়দান। কেন

তার 'বাঘপাড়া' নাম হ'লো কেউ বল্‌তে পারে না ;—কোনদিন সেখানে বাঘ দেখা যায় নি ; কিন্তু, বাঘের নাম শুনেই আমাদের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল। ময়দানটি বিশাল—প্রায় ৫।৬ মাইল লম্বা ; মাঝে মাঝে দু'চারটি বড় বট অশত্থ গাছ। ময়দানের শেষ দিকে দু'চারটি বড় আমগাছ আছে—সেখানে নাকি ভূত থাকে ব'লে শোনা যায় ; তাই কেউ যায় না সেখানে। আমরা সেই ময়দানে পৌঁছালাম। চারিদিকেই ধূ ধূ ময়দান—মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ। এক একটি ক'রে সেই সব ঝোপে খোঁজা বড় সহজ ব্যাপার নয়। সারাদিনে আমরা প্রায় ত্রিশটি ঝোপ খুঁজ্‌লাম ; সন্ধ্যা হ'লে সকলে বাড়ী ফিরে এলাম। অন্যদিকে যা'রা গিয়েছিল তারাও সন্ধ্যার সময় নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল।

পরদিন সকালে আবার আমরা দল বেঁধে রওয়ানা হ'লাম। এবার ছোট ছোট ঝোপ ছেড়ে একেবারে মাঠের ওপারে আম-ঝাড়ের দিকে খোঁজ করা হবে ঠিক হ'লো। সে ঝোপ প্রায় ৯ মাইল দূরে। রোদে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে বেলা ১২টার সময় আমরা ময়দান পার হ'য়ে আমঝাড়ের কাছে উপস্থিত হ'লাম। ভূতুড়ে আমগাছের কাছে যেতে সকলেই একটু-আধটু ভয় পাচ্ছিল, তাই কিছুক্ষণ পরামর্শ চল্‌ল কি করা যায়। আমি বল্‌লাম, "ভূতেরা তো দিনের বেলা দেখা দেয় না শুনেছি ; তবে আমাদের কিসের ভয় ?" বিনয়ের মামা ভবতোষবাবু বল্‌লেন, "ভূত সত্যি-সত্যি ওখানে আছে কিনা কেউ জানে না ; শুধু তো গুজব শুনেই

আমরা ভূতের ভয় পাচ্ছি। দিনের বেলা আবার ভয় কিসের? খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা ঐ দিকেই যাই চল। যাঁ'রা ভয় পাচ্ছে তা'রা বরং এখানেই থাকুক।" তখন সকলেই যেতে রাজী হ'লো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বেলা প্রায় তিনটার সময় আম-ঝাড়ের দিকে রওয়ানা হ'লাম। সেখান থেকে আমঝাড় প্রায় আধঘণ্টার পথ। আগে ভবতোষবাবু আর দুটি ভদ্রলোক চল্‌তে লাগ্‌লেন; আমরা ছেলেমানুষ, তাই পিছনে চল্‌লাম!

আমঝাড়ে পৌঁছে সকলের মনে কেমন যেন একটা ভয়ের ভাব এল। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ, চারিদিকেই গাছের ছায়া পড়েছে। শুধু ঝিঁঝিঁপোকার 'ঝিঁঝিঁ' ডাক আর থেকে থেকে "পূত্‌" "পূত্‌" কুক্কোপাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমরা চারিদিকে দেখ্‌ছি—উপরের দিকে আর কারো দৃষ্টি যাচ্ছে না। হঠাৎ ভবতোষবাবু চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"ঐ—ঐ"—সকলের বুক ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল।

ভবতোষবাবু বল্‌লেন "ঐ—ঐ!"

আঙ্গুল দিয়ে ডাইনে দেখিয়ে ভবতোষবাবু হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গেলেন; আমরাও সকলে তাঁ'র পিছনে চল্‌লাম। একটু এগিয়ে

দেখি, প্রকাণ্ড এক আমগাছের গোড়ায় পাঁচটি লোক প'ড়ে আছে—তাদের জামা-কাপড় ছেঁড়া, চুল উস্কো-খুস্কো, গায়ে কাদা-মাটি লেগে। একটু কাছে গিয়ে দেখি, এযে সত্যেশ, বিনয়, হেমেন্দ্র, পরেশ আর অবিনাশ।

ভবতোষবাবু নাড়ী দেখ্‌তে জান্‌তেন; তিনি সকলের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন, "নাড়ী বেশ তাজা আছে; বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে এরা!"

তখনই মুখে জল ছিটান, বাতাস দেওয়া, কড়া "স্মেলিং সল্‌ট" শোঁকান আরম্ভ হ'লো আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ জনেই চোখ মেলে চাইল। সকলেরই যেন ঢুলু ঢুলু ভাব আর কেমন যেন অন্যমনস্ক।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে; কাজেই এক মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে তাদের নিয়ে রওয়ানা হবার ব্যবস্থা করা হ'লো। তারা সকলেই বল্‌ল যে হেঁটেই যেতে পার্‌বে, কিন্তু ভবতোষবাবু কিছুতেই দিলেন না। দু'জনে কাঁধে ক'রে এক এক জনকে নিয়ে রওয়ানা হ'লো। মাঠের হাওয়ায় সকলেই অল্পদূর গিয়ে তাজা হ'য়ে উঠ্‌ল আর হেঁটে যাবার জন্য দোহাই-দস্তুর করতে লাগ্‌ল। তখন সকলেরই কাঁধ ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তাই আপত্তি আর হ'লো না। পথে যাবার সময় তা'দের যত প্রশ্ন করা হ'লো একটারও উত্তর পাওয়া গেল না। সকলেই বল্‌ল, "মাথা ঘূর্‌ছে এখন; বাড়ী গিয়ে সব কথা বল্‌ব।"

রাত নয়টার সময় আমরা কাট্‌না পোঁছালাম। দু'চার জন লোক

ফিরেছিল ; আগেই তা'রা সকলকে খবর দিয়েছে। কাজেই, আমরা পথেই অনেক লোকের ভিড় পেলাম। রাত্রে আর অন্য কোন কথা হ'লো না। বাড়ী ফিরেই সকলে ক্লান্তশরীরে বিছানায় শু'লাম আর ভোরবেলা উঠ্‌লাম ; গা-হাত পায় তখনও ব্যথা কর্‌ছে সকলের।

পরের দিন নরেশবাবুর বৈঠকখানায় মস্ত সভা বস্‌ল। গ্রামের গণ্যমান্য সব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সত্যেশ আর তার চার বন্ধু তখন ঘুম থেকে ওঠে নি। বিনয় আগের রাত্রে তা'র মামাকে ব'লেছিল, "কি যে ঘটেছিল, ভাল ক'রে বল্‌তে পার্‌ব না। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে বাগান কর্‌বার জন্য ঘর থেকে বেরুলাম। হঠাৎ বাঘে না কিসে যেন কি কর্‌ল, সব যেন ঘুলিয়ে গেল।"

কেদারবাবু বল্‌লেন, "ছেলেগুলো যে বেঁচেছে, এই ঢের। এবার এক চোট ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে হবে এদের ; না হ'লে শেষটায় ধনুষ্টঙ্কার হ'তে পারে।"

ভূষণবাবু ভাল শিকারী ; তিনি বল্‌লেন, "বাঘগুলো যে কোন্ চুলোয় গেল ;—একবার দেখা পেলে হ'তো।"

অনুকূলবাবু বল্‌লেন, "সব ব্যাপারটা বেজায় হেঁয়ালি গোছের ঠেক্‌ছে। যেন একটা ভূতুড়ে কাণ্ড!"

বিনয়ের ঘরে বসেছিলাম ; হঠাৎ রামা চাকরটা এসে বল্‌ল, "আমিই মাঝখান থেকে ফাঁক পড়্‌লাম। মাত্র দুটো টাকা।"

আমি বল্‌লাম, "কিরে! 'দুটো টাকা' কিসের?" রামা বল্‌ল,

"দেখ না দাদাবাবু! পরেশদাদা আমাকে বলেছিল, 'কাউকে যদি কিছু না বলিস্ তোকে দু'টাকা বক্‌সিস্ দেবো। গুপ্তধন যদি পাই তা হ'লে বেশ মোটা টাকা পাবি।' গুপ্তধনও মিল্‌ল না, আমিও ঠ'কে গেলাম।" আমি শুধু আস্তে বল্‌লাম, "আমিও—" এমন সময় পরেশ এসে হাজির।

রামাকে তাড়িয়ে দিয়ে পরেশ দরজাটা ভেজিয়ে ধপাস্ ক'রে তক্তপোষের উপর ব'সে পড়্‌ল। পকেট থেকে সেই সেদিনের খামখানা বের ক'রে, তার মধ্যের কাগজের টুক্‌রোগুলো তক্তপোষে সাজিয়ে আমাকে বল্‌ল—"পড়।" আমি প'ড়ে দেখ্‌লাম তাতে লেখা আছে—

* * * গুপ্ত ধন * * * * যদি চাও * * *
* * * কাট্‌না থেকে * * * * উত্তরে * * *
* * * শেষে মাঠে * * * * তা'রপর * * *
* * * আম গাছ * * * * গোড়ায় * * *
* * * মাটি খোঁড়া * * * * গভীর * * *
* * * তলার মাটি * * * * শুক্‌না লাল * * *
* * * কাঠের সিন্দুকে * * * * ফুলের কাজ * * *
* * * খুলে দেখ্‌বে * * * * সোণা হীরা * * *
* * * রয়েছে * * * * * * * * * *

চিঠির যে অংশ পাওয়া গেছে তা' থেকে এইটুকু পাওয়া যায়; বাকিটা কি আছে জানি না।

পরেশ বল্‌ল, "এর থেকে কি বুঝ্‌বে? গুপ্তধন সম্বন্ধে এর চেয়ে পরিষ্কার খবর আর কি পাওয়া যেতে পারে?" চিঠিটা রামধনকে লেখা হয়েছিল ; হাতের লেখাও পঞ্চাননের।

আমার বড় কৌতূহল হ'লো। আমি শুধু বল্‌লাম, "তার পর?"

পরেশ বল্‌ল, "তার পর আর কি? ঐ চিঠির জোরেই আমরা গুপ্তধনের সন্ধানে তোড়-জোড় নিয়ে বাঘপাড়ার মাঠের শেষে আম গাছের গোড়া খুঁড়্‌তে যাই। রাত্রে বাগান করার সরঞ্জাম, টর্চ্চ-লাইট সবই সঙ্গে নিয়েছিলাম। পাছে কেউ টের পায় তাই অমাবস্যার গভীর রাত্রে রওয়ানা হয়েছিলাম। বিনয় বলেছিল, 'সাবধানের মার নাই ; আমরা সব বাঘের পায়ের ছাপওয়ালা রবার-সোল জুতো প'রে রওয়ানা হব ; তারপর বালির উপর গিয়ে জুতো খুলে হেঁটে রওয়ানা দেবো।' অবিনাশ পাঁচ জোড়া রবার-সোল খুদে সুন্দর বাঘের পাঁড়ার নকল ক'রেছিল ; সেই সোলের জুতো বানিয়ে তাই প'রে রওয়ানা হ'লাম। আমরা ভয় ক'রেছিলাম অন্য কোন লোক টের পেলে গুপ্তধন কেড়ে নিতে পারে ; তাই এত সাবধানী। সেখানে গিয়ে আমরা দু'দিন ধ'রে খুঁড়েও যখন গুপ্তধনের কোন চিহ্ন বা লক্ষণ দেখ্‌লাম না, তখন হঠাৎ আমার মনে পড়্‌ল, আরেকটা খামে কয়েকটা কাগজের টুক্‌রো ছিল যার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় নি। সেটা নিয়ে তার কাগজগুলো এর সঙ্গে মিলালে হয়তো আরো কিছু অর্থ হ'তে পারে। তখনই আমি রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌লাম আর রাতারাতি বিনয়ের ঘর থেকে চুপচাপ কাগজ নিয়ে ফির্‌লাম। বিনয়ের

ঘরের সাম্‌নে রামার সঙ্গে দেখা। সে বেচারা চম্‌কে একেবারে চিৎপাৎ। আমি তা'কে চুপ করিয়ে বল্‌লাম, 'দু'টাকা বক্‌সিস্‌ দেবো; খবরদার কাউকে বলিস্‌ নে। আমরা মরি নি। গুপ্তধন পেলে তোকে বেশ মোটা বক্‌সিস্‌ দেবো।' আমাদের খোঁজের কি ব্যবস্থা হয়েছিল, বাঘে খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কি জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, সবই রামা আমাকে বলেছিল। আমি দেখ্‌লাম, সেদিন যদি গুপ্তধন না পাই তা' হলে সবই মাটি হবে। তখনই আমগাছ-তলায় ফিরে, আগের কাগজের সঙ্গে পরের কাগজ মিলিয়ে যা' দেখ্‌লাম তা'তে আমাদের চক্ষু স্থির! চিঠিটা শেষটায় এই দাঁড়াল :—

'অনন্ত গুপ্ত ধনঞ্জয় গুপ্তের ছেলে। যদি চাও তো তার কাছে কাট্‌না থেকে চিঠি লিখে দেবো। উত্তরের অপেক্ষায় থাক্‌লে শেষে মাঠে মারা যাবে কাজটা। তারপর, আমাদের সেই আম গাছ সম্বন্ধে মোকদ্দমার গোড়ায় অন্যপক্ষ সেদিন যে মাটি গোঁড়া দেখিয়ে বলেছিল, গভীর খুঁড়ে তা'রা দেখাবে তলার মাটি অনেকটা শুক্‌না ও লাল, সেটার কি হ'লো? কাঠের সিন্দুকে ছুতার মিস্ত্রীকে ফুলের কাজ করতে দিয়েছি, সেটাকে খুলে দেখ্‌বে ঢাক্‌নির নীচে সোণা হীরা দু'ভায়ের নাম খোদাই রয়েছে কি না। * * *'

"আসলে দুটো খামে একই চিঠির কয়েকটি ক'রে টুক্‌রো ছিল। গোড়ায় ভাল ক'রে মিলিয়ে দেখ্‌লেই গোল চুকে যেত। কি আর করা যায়? গুপ্তধন তো গেল চুলোয়, এখন শেষরক্ষা হয় কেমন ক'রে? হেমেন্দ্র বল্‌ল, 'এখন বাঘে ধরাটা সত্যি হওয়া ছাড়া কোন

উপায় দেখি না।' তখনই পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'লো, পরের দিন সেখানে লোক খুঁজ্‌তে আস্‌বার আগেই আমরা জামা-কাপড় ছিঁড়ে, কাদা-মাটি মেখে প্রস্তুত থাক্‌ব ; একজন গাছে চ'ড়ে দেখ্‌তে থাক্‌বে কেউ খুঁজ্‌তে আস্‌ছে কিনা। যেই সে সঙ্কেত কর্‌বে অম্‌নি আমরা 'অজ্ঞান' হ'য়ে শুয়ে পড়্‌ব।—তা'র পর যা' ঘটেছে তা' তো জানই ভাই ; বেশী বাড়িয়ে আর কাজ কি ? আমার সাইকেলটা আর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবই সেখানে প'ড়ে আছে। একদিন লুকিয়ে গিয়ে সেগুলো নিয়ে আস্‌তে হবে।"

*　　　*　　　*　　　*

পরের দিন নাকি কাট্‌নায় একটি "সার্ব্বজনীন শার্দ্দূল-সংহারিণী-সমিতি" গঠিত হ'য়েছিল।

নিরুদ্দেশ

রমেশ ছেলেটা একটু পাগ্‌লাটে গোছের। শরীরে তা'র আশ্চর্য্য ক্ষমতা, চেহারাখানাও তেম্নি বিরাট। বড়লোকের ছেলে, নিজের মোটর আছে, চালাতেও পারে খুব ভাল,—তাই বি-এ পরীক্ষা দিয়ে সে দিন-রাত মোটর নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ যাচ্ছে হরিহরনগর, কাল ফাক্‌না, পরশু ভজহরিপুর—আবার তা'র পরের দিনই দেখ সে ফিরে এসেছে।

প্রমথ যে এক্স্‌পার্ট ডিটেক্‌টিভ হয়েছে সেটা রমেশের বিশ্বাসই হয় না। জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডের বড় বড় ডিটেক্‌টিভের আড্ডায় থেকে, তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভাল ভাল সার্টিফিকেট নিয়ে প্রমথ সেদিন বিলাত থেকে ফিরেছে। সরকারী ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে তার ৮০০৲ টাকা মাইনের চাকরী পাবার কথা হচ্ছে। তবু রমেশ তা'কে হেসেই উড়িয়ে দেয়। প্রমথ মুচ্‌কি হেসে বলে, "একদিন বুঝ্‌বে ভায়া! ফাঁপরে পড়্‌লে শর্ম্মা ছাড়া আর গতি নাই। সবুরে মেওয়া ফলে!"

সেদিন সকালে আমরা প্রমথর বাড়ীর বৈঠকখানায় ব'সে গল্প কর্‌ছি, এমন সময় রমেশ এসে বল্‌ল, "আজ ভাই হরিহরনগর

যাচ্ছি। তুমি তো সেবার বলেছিলে, যখন যাব আমার সঙ্গে যাবে—চল-না ভাই!" প্রমথ বল্‌ল "আজ আবার আমাকে পীরনগরে একটা কেসে যেতে হবে—বড় Interesting কেস্। তুমি ক'টায় রওয়ানা হবে?" রমেশ বল্‌ল "আমি ৮৷৷০ টায় যাব।" প্রমথ বল্‌ল "আমাকেও প্রায় ঐ সময়ই যেতে হবে। দু'জনে এক সঙ্গে রওয়ানা হওয়া যাবে,—কি বল? আমি আমার উইলিস্-নাইট্ সেডানখানা নেবো।" রমেশ বল্‌ল, "আচ্ছা, তাই হবে। আমি আমার ফোর্ডেই পাড়ি দেবো। তা' হ'লে এখন চল্‌লাম ভাই; স্নান, খাওয়া-দাওয়া সেরে তো বের হ'তে হবে।"

ঠিক সাড়ে আটটার সময় রমেশ একটা ছেঁড়া কোট প'রে, পুরাণো তেলমাখা একটা টুপি মাথায় দিয়ে তার 'টু-সিটার' ফোর্ডখানা নিয়ে প্রমথদের বাড়ীর সাম্নে হাজির হ'লো। প্রমথও তখন প্রস্তুত; শুধু পীরনগর থানার দারোগার কয়েকটা কাগজ নিয়ে আস্‌বার কথা, সেজন্য সে অপেক্ষা কর্‌ছে। খানিক বাদে দারোগা এসে হাজির হ'লো—কিন্তু কাগজপত্রের একখানা উকিলের বাড়ী ফেলে এসেছিল ব'লে আবার তা'কে কাগজ আন্‌তে পাঠান হ'লো। প্রমথ রমেশকে ডেকে বল্‌ল, "তুমি রওয়ানা হয়ে পড় ভাই; আমার যেতে কত দেরী হবে কে জানে?" রমেশও তখনই রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌ল। আমি প্রমথর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তা'র উইলিস্-নাইটে চ'ড়ে বসেছিলাম; কাজেই আমিও পিছনে প'ড়ে রইলাম।

যা হোক্; দারোগার ফির্‌তে বেশী দেরী হ'লো না; রমেশ

যাবার দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই সে কাগজ নিয়ে এসে হাজির হ'লো। আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়্লাম।

তখনও গরম পড়ে নি, রোদের ঝাঁঝ মোটেই নাই। বেশ দিব্যি ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইছে; আমরাও খুব আরামে চ'লেছি। সোজা রাস্তা, দুধারে মাঠ; মাঝে মাঝে শুধু রাস্তায় একটু চড়াই-উৎরাই। কোন কোন জায়গায় রাস্তার কাছেই ছোট ছোট টিপি আছে; কোন কোন জায়গার জমি উঁচু নীচু। ক্রমে দু-ধারের জমি একটু বেশী উঁচু নীচু হয়ে গেছে।

আমরা তখন পীরনগরের কাছাকাছি; রাস্তা খুব সোজা, তাই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মনে হ'লো, দূরে রাস্তার ধারে নালার পাশে একটা মোটর কাৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে। ক্রমে কাছে এসে দেখ্লাম, এ যে রমেশের মোটর! তখনই আমরা মোটর থেকে নেমে ছুটে দেখ্তে গেলাম ব্যাপারখানা কি! মোটরটা বেশী কিছু জখম হয় নি; শুধু বাঁ পাশের মাড্গার্ড দুখানা দুম্‌ড়ে গেছে আর Wind screenএর কাঁচটা ভেঙ্গেছে। রমেশকে কিন্তু কোথাও দেখ্তে পেলাম না। "রমেশ!" "রমেশ!" ব'লে কত ডাক্লাম্, কোনই সাড়াশব্দ পেলাম না।

পাশেই একটা টিপি ছিল, তার উপর চড়ে চারিদিকের দৃশ্য অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখ্তে পাওয়া যায়। সেটার উপর চ'ড়ে আমরা চারিদিক দেখ্তে লাগ্লাম; সঙ্গে বাইনোকিউলার ছিল, তা' দিয়েও দেখ্লাম—রমেশের কোন চিহ্ন নাই।

ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হ'লো। রমেশ রওয়ানা হবার ১০।১২ মিনিট পরেই আমরা রওয়ানা হয়েছি; আমাদের গাড়ীর speedও অনেক বেশী। রমেশের accidentটা হবার বড় জোর ৫।৭ মিনিট পর আমরা সেখানে পৌঁছেছি; অথচ রমেশের কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। যদি দৌড়েও গিয়ে থাকে, ৫।৭ মিনিটের মধ্যে সে অদৃশ্য হতেই পারে না, কারণ চারিদিকে সমান জমি থাকাতে ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর দৌড়েই বা যাবে কেমন ক'রে? Wind screenটা যে-ভাবে ভেঙেছে, তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রমেশ সেটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে—সম্ভবতঃ তা'র মাথাটাই ঠুকেছে। তা' হ'লে সে অন্ততঃ কিছুক্ষণ মাথা ঘুরে পড়েছিল। তা'র পরই উঠে তাড়াতাড়ি চলা তা'র পক্ষে অসম্ভব হবে—দৌড়ান ত দূরের কথা। আর, কেনই বা সে দৌড়াতে যাবে? যদি দৌড়ে না গিয়ে থাকে তা'হলে তো এতক্ষণে বেশীদূরও যেতে পারে নি। তবে কেন তা'কে দেখা যাচ্ছে না? যদি বেশীরকম জখম হয়ে থাকে আর নিজে চল্‌তে না পারায় অন্য কেউ তা'কে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা' হ'লে তো দেখাই যেত। অত বড় লাশ ব'য়ে নিয়ে যাওয়া কি কম কথা!

এই রকম নানা জল্পনা-কল্পনা চ'লেছে, এমন সময় প্রমথ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "চল চল, শীগ্‌গির চল! বাঁ দিকের ঐ খাদটার দিকে গিয়ে দেখে আসি।" বাঁয়ে, প্রায় ৩০০ হাত দূরে একটা খাদ দেখা যাচ্ছে, সেটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে প্রমথ দেখা'ল। আমরাও উচ্চবাচ্য না

ক'রে তার সঙ্গ নিলাম। খাদের ধারে গিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম খাদ বেশী গভীর নয়; নীচে একটা ছোট ঝর্‌ণা ব'য়ে গেছে। প্রমথ চেয়ে দেখে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "ঐ ঐ!" আমরাও চেয়ে দেখ্‌লাম, খাদের এক পাশে রমেশের গায়ের কোটটা আর টুপিটা প'ড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি খাদের নীচে নাম্‌বার জন্য আমরা একটু পেছিয়ে গেলাম। এক জায়গায় মাটিতে ধাপ কাটা আছে দেখে সেখান দিয়ে আস্তে আস্তে নাম্‌তে লাগ্‌লাম। ধাপের মাটি নরম ছিল; তা'র উপর পায়ের দাগও ছিল। প্রমথ দাগ পরীক্ষা ক'রে বল্‌ল, "যে লোক এখান দিয়ে নেমেছে তার পা ছোট; কিন্তু পায়ের চেহারা দেখ্‌লে বোঝা যায় লোকটির বয়স অনেক। আরেকটি অস্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে সেও বয়স্ক লোকেরই; তবে, এ দাগ অনেক বড় পায়ের। এর কোনটাই রমেশের পায়ের দাগ হ'তে পারে না। আর, খালি পায়ে সে যাবেই বা কেন?" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে আমরা নীচে নেমে পড়্‌লাম।

রমেশের কোট আর টুপি হাতে তুলে নিয়ে প্রমথ অনেকক্ষণ ভাল ক'রে দেখ্‌ল। কোটের পকেটে কিছুই নাই; একটা পকেট ছিঁড়ে গেছে। পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝর্‌ণা ব'য়ে যাচ্ছে, তা'র জলে কোট আর টুপি ভিজে গেছে। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আশে-পাশে কোথাও পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না। প্রমথ বল্‌ল, "নিশ্চয়ই ঝর্‌ণার জলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল; না হ'লে পায়ের দাগ গেল

কোথায়? দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, দু'টি লোক রমেশকে ব'য়ে নিয়ে এই পথ দিয়ে গেছে। কিম্বা হয়তো উপর থেকে কেউ ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে; নীচে দুটি লোক ছিল, তা'রা ওকে তুলে নিয়ে চ'লে গেছে। পকেটে যা কিছু জিনিষপত্র ছিল তা লোক দুটি নিয়ে গিয়েছে; কোটটা ফেলে রেখে গিয়েছে। টুপিটা তো মাথা থেকে প'ড়ে যাবেই। এখন চল, আবার উপরে গিয়ে আশেপাশের জমি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্।"

উপরে উঠে খাদের কিনারের জমি পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, এক জায়গায় মাটি খানিকটা যেন ধ'সে পড়েছে। ঠিক তারই নীচে খাদের মধ্যে কোট আর টুপি পাওয়া গেছিল। তখন স্পষ্টই বোঝা গেল, রমেশকে ঐখান দিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আর একটু এগিয়ে, রাস্তার দিকে যেতে একটা হাতুড়ি পাওয়া গেল। একেবারে নতুন হাতুড়িটা, শুধু তা'র হাতলের উপর একটা আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে। ছাপ দেখে প্রমথ বল্‌ল, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে লোকটার পায়ের দাগ খাদের ধারে মাটির উপর পাওয়া গেছে, এ দাগ সেই লোকেরই হাতের আঙ্গুলের। পা দুটো যে ধরণের ধ্যাব্‌ড়া গোছের, হাতের আঙ্গুলও এর সেই রকমই ধ্যাব্‌ড়া—" কথা শেষ হ'তে না হ'তেই প্রমথ হঠাৎ চম্‌কে থেমে গিয়ে, চোখ বড় ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "দেখেছ?—এই দেখ! হাতুড়ির উপর রক্তের দাগ। এখন কি আর কোন সন্দেহ আছে? এ নিশ্চয়ই একটা খুনের ব্যাপার। চল শীগ্‌গির, আবার একবার খাদের মধ্যে নেমে

দেখি, লোকগুলো যেদিকে রমেশকে নিয়ে গেছে সেই দিকে এগিয়ে আর কিছু দেখ্‌তে পাই কি না।"

তাড়াতাড়ি খাদে নেমে আমরা এগিয়ে যেতে চেষ্টা কর্‌লাম। একটু যেতে প্রমথ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ঈ—ঈ—স্!" চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক জোঁক প্রমথর পায়ে কাম্‌ড়ে ধরেছে। চারিদিকেই দেখি জোঁকে কিল্‌বিল। সাম্নেও যাবার উপায় নেই; ঘন জঙ্গলে অন্ধকার। খাদ বেশী চওড়া নয়, তাই দু'ধারের গাছ নুইয়ে প'ড়ে ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে। তখন আর উপায় কি? তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

প্রমথর পায়ের জোঁক ছাড়িয়ে আমরা তখনই সেই হাতুড়ি, কোট আর টুপি নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর চালিয়ে পীরনগরের থানায় উপস্থিত হ'লাম। সেখানে পৌঁছে, প্রথমেই থানার ইন্‌স্পেক্টারকে কোট, টুপি আর হাতুড়ি দিয়ে সব ঘটনা বলা হ'লো; ডায়েরিতে সব কথা লেখাও হ'য়ে গেল।

তখনই ইন্‌স্পেক্টারবাবু ২।৩ জন কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাড়ীতে চ'ড়ে সেই জায়গায় ফিরে এলেন। সব দেখে শুনে তিনিও বল্‌লেন, "খুন যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু, এ রকম রহস্যময় খুন আমি আমার জীবনে দেখি নি। এত বড় লাশকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সরিয়ে ফেলা এক ব্যাপার! আশে-পাশে কোথাও তো লুকাবার জায়গা নেই। ব্যাপারটা যা হয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হাতুড়ির ঘা মেরে, অথবা হাতুড়ি ছুঁড়ে মেরে প্রথমে রমেশ-বাবুকে বে-দম করা হয়েছে। তখন মোটরটা খানায় প'ড়ে যাওয়ায়

রমেশবাবুর মাথা wind screenএ ঠুকে যায়; তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। এখনই এ বিষয়ের তদন্ত হওয়া দরকার।"

তখনই আমরা আবার থানায় ফিরে এলাম। তখন অনেক বেলা হয়েছে, তাই আমরা ডাকবাংলায় চ'লে গেলাম। স্নান খাওয়া সেরে বিষণ্ণমনে আবার থানায় এলাম। ইন্‌স্পেক্টারবাবু তখন একটা পুরস্কারের 'নোটিশ' লিখ্‌ছিলেন—যে এ বিষয়ে খবর এনে দিতে পারবে তাকে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রমথ তাঁকে বারণ ক'রে বল্‌ল, "দেখুন ইন্‌স্পেক্টারবাবু, অমন কাজও করবেন না। আগে নিজেদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে খুব ভাল রকম খোঁজপাত করুন; কল্‌কাতার সি-আই-ডি থেকে দু'টি পাকা লোক আনান্; আমি তা'দের সব বাৎলে দেবো; তা'রা এ বিষয়ে তদন্ত চালাক্। যদি দু'তিন দিনে কিছু না হয় তা' হ'লে শেষটায় নোটিশ দেওয়া যেতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টারবাবু বল্‌লেন, "আপনি স্বয়ং যখন উপস্থিত আছেন তখন আর ভাবনা কিসের? কল্‌কাতা থেকে সি-আই-ডি আন্‌তে হ'লে অনেক দেরি—সরকারী ব্যাপার তো আর চট্ ক'রে হবার জো নেই। উপরওয়ালা থেকে নীচ পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তর-মাফিক্ হুকুম, নোট ইত্যাদি হবার পর অর্ডার বেরুবে; ততদিনে এ কেস্ বাসি হয়ে যাবে। এমন serious case-এ এক মুহূর্ত্ত দেরি করা চলে না।"

এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার কতক্ষণ আর চাপা থাকে? বাড়ীতে, রাস্তায়, ডাকঘরে, ইস্কুলে, বাজারে, চা'য়ের দোকানে সেদিন শুধু একই কথা।

এদিকে, আমরা আবার সেই খুনের জায়গায় ফিরে এলাম। সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টারবাবু, দারোগা, ৮।১০ জন পুলিশ, একটি স্থানীয় ডিটেক্‌টিভ। প্রমথ যে ভাবে বাৎলে দিল সেই ভাবেই দুই তিন দলে ভাগ হয়ে সকলে তদন্তে চ'লে গেল। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সকলেই আবার ঘটনাস্থলে ফিরে এল—কোনই খবর নাই। নিরাশ হয়ে তখন সকলে রমেশের মোটরে থানায় ফিরে এলাম। প্রমথ অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে মাথায় হাত দিয়ে থেকে বল্‌ল, "পুরস্কারের 'নোটিশ'টা তা'হলে দিয়েই দিন্। রমেশের বাবা খুব বড়লোক ছিলেন—তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন! ওদের কোন টাকার অভাব নেই; ১০০০৲ ছেড়ে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কারও দিতে স্বীকার কর্‌লে কোন ভাবনা নেই; পুরস্কারের পূরো টাকা আদায় কর্‌বার ভার আমি নিলাম। বেশী টাকা পাবার লোভে অনেকেই এ বিষয়ের খোঁজ নেবে। খুনীর জানা লোক পুরস্কারের লোভেও খুনীকে ধরিয়ে দিতে পারে।"

তখনই ছাপ্‌তে দেওয়া হ'লো—"৫০০০৲ টাকা পুরস্কার" ইত্যাদি। রমেশবাবুর সম্বন্ধে যে সঠিক খবর দেবে, যা'র দ্বারা খুনীর সন্ধান পাওয়া যাবে, অথবা রমেশবাবু জীবিত থাক্‌লে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে, সে-ই এ পুরস্কারটা পাবে।

পরদিন সকালেই পীরনগরের রাস্তায়-ঘাটে দেওয়ালের উপর প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে দেওয়া হ'লো—৫০০০৲ টাকা পুরস্কার—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চারিদিকে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ, থানার সাম্নেও বিস্তর লোক;—কোন খবর পাওয়া যায় কি না। প্রমথর সঙ্গে আমিও থানায় গিয়ে ব'সে আছি; সকলের মুখেই গভীর ভাবনার চিহ্ন। কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, সকলেই খবর জিজ্ঞাসা ক'রে চ'লে যাচ্ছে। একটি লোক শুধু অনেকক্ষণ ধ'রে কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বড় পাগ্‌ড়ি, বড় চাপ-দাড়ি, লম্বা গোঁফ, চোখে কালো ঠুলি, পরণে ধুতি, পাঞ্জাবী, হাতে মোটা লাঠি। অনেকক্ষণ তা'কে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখায় দারোগাবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন তা'র কি চাই। সে এগিয়ে এসে আস্তে চাপা গলায় বল্‌ল যে বাইরের লোকের সাম্‌নে সে কিছু বল্‌তে পারে না; নিরিবিলি হ'লে বল্‌বে। তখনই বাইরের সব লোকদের বিদায় করা হ'লো, বাইরের দরজাটাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো।

লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়্‌ল। মাথার পাগ্‌ড়ি খুলে, লাঠিটা রেখে সে দাড়িতে হাত দিল। হঠাৎ এক-টানে দাড়ি গোঁফ খুলে ফেল্‌ল—সেগুলো ছিল নকল দাড়ি-গোঁফ।—ওমা! এযে রমেশ!

তখন স্পষ্ট-গলায় সে বল্‌ল, "রমেশবাবুকে জীবিত এনে হাজির ক'রেছি—এখন ৫০০০৲ টাকার পুরস্কারটা দিন্ তো আমায়!"

সকলে আমরা এত চম্‌কে গেছিলাম আর এত অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম যে মিনিটখানেক আর কা'রো মুখে কথা সর্‌ল না।

রমেশই প্রথম কথা বল্‌ল। প্রমথর দিকে চেয়ে, চোখ টিপে, মুচ্‌কি হেসে সে বল্‌ল "কিহে ডিটেক্‌টিভ সাহেব! খুনের ব্যাপারটা কি রকম একবার শুনিই না।"

প্রমথ বল্‌ল, "চল্ল চল! আর চালাকি মেরো না। মিছামিছি এতগুলো লোককে হয়্‌রাণ করালে, এত খরচপত্র করালে। ৫০০০৲ টাকা তো পাবেই। তবে, সে টাকাটা তোমাকেই বের কর্‌তে হবে, —লক্ষ্মী ছেলের মত একখানা ৫০০০৲ টাকার চেক্ লিখে ফেল তো। সেই চেক্ ভাঙ্গান হ'লেই তোমায় ৫০০০৲ টাকা দেওয়া হবে। এখন বাড়ী যাই চল!"

তখনই আমরা তিন জনে ডাকবাংলায় ফির্‌লাম। প্রমথ বেচারার মুখ একেবারে কাঁচু মাচু, সে ফির্‌বার সময়ই বল্‌ল, "আমি ঠিক জানি তুমি গা ঢাকা দিয়েছিলে।" রমেশ বল্‌ল, "আর চাল মেরো না দাদা! তোমার বিদ্যে সব বোঝা গেছে।"

ডাকবাংলায় ফিরে রমেশ সব ঘটনা খুলে বল্‌ল, "পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখ্‌লাম বন্ধু হিতেন ঘোষের মোটর থেমে আছে। নেমে হিতেনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ব্যাপারখানা কি! হিতেন বল্‌ল, 'সাম্নের টায়ার দুটো আরেকটু পাম্প করা দরকার; তাই দাঁড়িয়েছি।' আমিও দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।"

"হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি জাগ্‌ল। তখনই কোটের পকেট

থেকে সব জিনিষপত্র বের ক'রে নিয়ে পাশের পকেটটা টেনে ছিঁড়ে, কোটটা আর টুপিটা খাদের মধ্যে ফেলে দিলাম। তারপর মোটরটাকে আস্তে আস্তে ঠেলে নালায় ফেল্‌লাম; একটা হাতুড়ি দিয়ে Wind screen-এর কাঁচখানাকেও ভাঙ্‌লাম। তাড়াতাড়িতে হাতটা একটু কেটে গেল, তাই রেগে হাতুড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর হিতেনের মোটরে সোজা পাড়ি দিলাম। সে গেল হরিহরনগর—আমি পরে পীরনগরেই নেমে রইলাম—শুধু মজা দেখ্‌বার জন্য। তারপব যা' হ'লো তা' আর ব'লে দরকার কি? থানায় যা' কিছু ঘট্‌ছিল সবই আমি সঙ্গে সঙ্গে জান্‌তে পেরেছি—আমার একটি চর থানায় দু'দিন হ'লো চাক্‌রি নিয়েছে। যখন দেখ্‌লাম ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার, তখন আর লোভ সাম্‌লান গেল না। খুন তো হয়েছেই—তার প্রমাণও তোমরা নাকি পেয়েছিলে—তবে লাশটা উধাও হওয়া কোন কাজের কথা নয়; তাই এই জল-জ্যান্ত লাশখানা সশরীরে থানায় হাজির হ'লো। এখন ডিটেক্‌টিভ সাহেব কি বলেন?"—প্রমথর মুখে কথাটি নাই, বেচারা বল্‌বে আর কি?

নাম চুরি

ছেলেটির বাড়ী ছিল জাপানে; বয়স খুব বেশী নয়। চেহারাখানা জাপানীরই মত—বেঁটে, ফর্সা, খাঁদা নাক—কিন্তু শরীরে তা'র অসাধারণ শক্তি। বুদ্ধিটিও যদি ঐ রকমের হ'তো তবে তো রক্ষা ছিল; কিন্তু বেচারার ঘটে মোটেই বুদ্ধি ছিল না। বাপ-মা হার মেনে শেষটায় কুল-পুরোহিতের বাড়ীতে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, "গুরুঠাকুর! ছেলের সঙ্গে আমরা তো পেরে উঠ্‌লাম না। এখন আপনার হাতে একে সঁপে দিলাম; আপনারই কাছে থেকে লেখাপড়া শিখ্‌বে; কাজকর্ম্ম একটু-আধটু যা' পারে একে দিয়ে করিয়ে নেবেন। আর উপযুক্ত দুটি নাম দেবেন;—আমরা তো এর নামই খুঁজে পেলাম না।"

গুরুঠাকুর তো ছেলেটিকে দেখে খুব খুসী হ'লেন। চেহারাখানা তা'র দিব্য ফুট্‌ফুটে নাদুস্ নুদুস্; মুখে হাসি লেগেই আছে। কোন বাবুগিরি নাই ছেলেটির; মোটা ভাত কাপড়েই সে সন্তুষ্ট।

কিন্তু ছেলেটির বুদ্ধি একেবারে মগজ-ঠাসা। যে কাজ তা'কে দেওয়া যাবে তা'ই সে গোলমাল ক'রে ফেল্‌বে। লেখাপড়াও বেশী করার মত তা'র ঘটে বুদ্ধি নেই। তাই গুরুঠাকুর বছর দু'এক

ছেলেটিকে পড়িয়ে, একটু-আধটু কাজকর্ম্ম আর আদব-কায়দা শিখিয়ে, তা'কে একবার বাপ-মায়ের কাছে বেড়িয়ে আস্‌তে বল্‌লেন।

ছেলের নাম আর কি দেবেন? অন্য কিছু না পেয়ে শেষটায় "সিয়ো-বা" (অর্থাৎ, 'ঢের হয়েছে') আর "ফুতা-বা" (অর্থাৎ, 'আর না') এই দুটি নাম পছন্দ কর্‌লেন। নাম দুটি ছেলেকে মুখস্থ ক'রে নিতে বল্‌লেন,—সে অনেক চেষ্টাও কর্‌ল, কিন্তু কিছুতেই মনে রাখ্‌তে আর পারে না। তখন গুরুঠাকুর দু'খানা ছোট পাতলা তক্তায় "সিয়ো-বা" আর "ফুতা-বা" লিখে ছেলের দুই কব্জি থেকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন আর ব'লে দিলেন যে, পথে যাবার সময়ও যেন মুখস্থ কর্‌তে কর্‌তে চলে।

বেশ ভাল ক'রে বাড়ীর রাস্তা চিনিয়ে দিয়ে, গুরুঠাকুর তো তাঁর ছাত্রকে রওয়ানা ক'রে দিলেন; ছাত্রও হেল্‌তে দুল্‌তে "সিয়ো-বা" "ফুতা-বা" বল্‌তে বল্‌তে বাড়ীপানে রওয়ানা হ'লো। অনেকদিন পর বাড়ী যাচ্ছে তাই তার মনে খুব ফূর্ত্তি! মুখে "সিয়ো-বা" "ফুতা-বা" ছাড়া কথা নেই, কিন্তু চোখে মুখে তার আনন্দ। রাস্তা-চলার কষ্ট তার মনেই হচ্ছে না।

অনেক দূর যাবার পর সাম্নে একটা ছোট খাল দেখা গেল। ছেলেটি কাপড় চোপড় সাম্‌লে নিয়ে খালের জলে নেমে পড়্‌ল; কিন্তু একটু দূর গিয়েই সে বুঝ্‌তে পার্‌ল যে সাঁতার দেওয়া ছাড়া উপায় নাই, কারণ খাল বেশ গভীর। তখন সে সাঁতার দিতে আরম্ভ কর্‌ল। স্রোত বেশী থাকায় তা'কে একটু বেগ পেতে

হ'লো বটে ; কিন্তু ওস্তাদ সাঁতারে ছিল ব'লে স্রোত তা'কে কাবু কর্‌তে পারে নি।

অপর পারে পৌঁছেই সে আগে হাতের সেই নাম-লেখা তক্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল। কি সর্ব্বনাশ! নাম যে একেবারে ধুয়ে গেছে! চিহ্নও নাই কোন অক্ষরের! সাতার দেওয়ার গোলমালে সে অন্যমনস্ক হয়ে নাম দুটোও ভুলে গেছে। বেচারা এখন করে কি?

খালের জলের উপরেই তার রাগ বেশী। যখন সে ওপারে ছিল তখন তো নাম দুটো দিব্যি স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল; খালের জলে নাম্‌তেই তো যত গোল হ'লো। ঐ খালের জলই নিশ্চয় তার নাম চুরি করেছে, কিম্বা লেখাগুলো জলে ডুবে গেছে!

তখন সে আবার কাপড় সাম্‌লে নিয়ে খালের জল ছেঁচ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। খানিকটা জল ডাঙ্গায় ফেলে আর চেয়ে দেখে নাম উঠ্‌ল কিনা। এই ভাবে সে অনেকক্ষণ ধ'রে জল ছেঁচ্‌তে লাগ্‌ল।

একটি লোক মাছ ধরার জন্য ঐ খাল জমা নিয়েছিল—অর্থাৎ, কিছু টাকা দিয়ে, খালের জলে মাছ ধর্‌বার অধিকারটা কিনে নিয়েছিল। সে ছেলেটিকে ঐ ভাবে জল ছেঁচ্‌তে দেখে মনে কর্‌ল তা'র খালের মাছ বুঝি ধ'রে নেবে। অম্‌নি সে এসে ছেলেটিকে বল্‌ল, "কিহে, আমার খালের জল ছেঁচ্‌ছ কেন?"

ছেলেটি বল্‌ল, "তোমার খাল নাকি?—ভারি দুষ্টু তো এ খালটা; আমার নাম চুরি করেছে। নাম ফিরিয়ে দাও, নইলে আমি খালের সব জল ছেঁচে নাম বের করব তবে ছাড়্‌ব।"

লোকটি বল্‌ল, "আচ্ছা পাগল তো হে তুমি! খাল আবার কখনো নাম চুরি কর্‌তে পারে নাকি? তোমার ওসব বাজে কথা শুন্‌ছি না; আর এক ফোঁটা জলও ছেঁচ্‌তে দেবো না।"

ছেলেটি বল্‌ল, "কে শুন্‌বে তোমার কথা? আমার তো ভারি ব'য়ে গেছে!" লোকটি বল্‌ল, "তোমার ঘাড় শুন্‌বে।"

ক্রমে মুখোমুখি থেকে একেবারে হাতাহাতি স্থুরু হয়ে গেল। ছেলেটির অল্প বয়স হ'লেও শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল; কাজেই হাতা-হাতিতে খালের মালিক বড় স্থবিধা কর্‌তে পার্‌ল না। কিছুক্ষণ মারামারির পর সে কাবু হ'য়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল "সিয়ো-বা"—"ফুতা-বা" ('ঢের হয়েছে' 'আর না')!—

অম্নি, কোথায় গেল তা'র মারামারি, কোথায় গেল তার রাগ; ছেলেটি আনন্দে লাফাতে লাফাতে, "নাম পেয়েছি"—"নাম পেয়েছি"—"সিয়ো-বা" "ফুতা-বা"—বল্‌তে বল্‌তে বাড়ীপানে ছুট্‌ দিল। খালের মালিক অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে রইল; সে এ সবের কোন অর্থই বুঝ্‌ল না।

খুলিয়া বলিলে তাঁহারা তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সেই সিংহটিকেও তাঁহারা তাহাকে দান করিলেন। সেই সিংহ লইয়া সে রোমের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সিংহ কাহাকেও কিছু বলিত না।

অনুশীলনী

১। ক্রীতদাস কাহাকে বলে।

২। গল্পের ক্রীতদাস বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়াছিল কেন? আবার ফিরিয়াই বা আসিল কেন?

৩। শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :—

ক্ষুধা পাইলে সে বনের—খাইত ও তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য পর্ব্বতের—হইতে—পান করিত।

সে দেখিল যে সিংহের থাবায় একটি বড়—ফুটিয়া রহিয়াছে।

৪। পুরাকালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক্রীতদাসদের কিরূপভাবে শাস্তি দেওয়া হইত।

মহম্মদ মহসিন্

তোমাদের নিকট একজন মহৎ লোকের কথা বলিব। এই মহাপুরুষের নাম হাজি মহম্মদ মহসিন্।

হুগলী নগরে এক বিখ্যাত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মধুর ও নম্র ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনি অতি সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার এক ভগিনী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি মহসিন্‌কে প্রচুর টাকা দিয়া যান। টাকা পাইয়াও মহসিন্ আগের মতই সাদাসিধা ভাবে চলিতে লাগিলেন। অপরের দুঃখ দেখিলে মহসিন্ অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন ও তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন। কখনও কোন ভিখারী তাঁহার দরজা হইতে শুধু হাতে ফিরিয়া যাইত না। এমন কি তিনি খোঁজ করিয়া দুঃখী ও দরিদ্র লোকেদের সাহায্য করিতেন।

একদিন রাত্রে মহসিন্ নগরের মধ্যে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় তিনি একটি বাড়ীর ভিতর হইতে ছোট ছোট ছেলের কান্না শুনিতে পাইলেন। মহসিন্ সেই বাড়ীর দরজায় উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাহাদের মা'কে ঘিরিয়া কাঁদিতেছে। তাহারা অতি দুঃখী;